আশ্বিন
১৪০১

কথাসাহিত্য

৪৫ বর্ষ

আশাপূর্ণা দেবী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
অমর মিত্র, শচীন মুস্তফী, অরুণকুমার
মুখোপাধ্যায়, বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রদীপ ভাদুড়ী, শৈবাল চক্রবর্তী,
নরেশচন্দ্র জানা, অমলেন্দু মিত্র
ও আরো অনেকে

■ পুস্তকমেলায় প্রকাশিত বই ■

উপন্যাস ও গল্প

আশাপূর্ণা দেবীর
দিব্যহাসিনীর দিনলিপি ৩৫৲
আবার ফিরে দেখা ১০০৲

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
গল্প সমগ্র (২য়) ৭৫৲

সমরেশ মজুমদারের
এখনও সময় আছে ৪০৲ গল্প সমগ্র ৭৫৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
পিপুল ১৫৲

শক্তিপদ রাজগুরুর
দেশ কাল পাত্র ৩৫৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের — কনকলতা ৩০৲

আবুল বাশারের
গল্প সমগ্র (১ম) ৮০৲

প্রতিভা বসুর
পরশপাথর ৩০৲

কল্যাণী ঘোষের
আঁধার যে কথা বলে ২৫৲

জয়কৃষ্ণ কয়ালের
নাভিমূল ৪০৲

প্রবন্ধ

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
প্রবন্ধ সমগ্র (১ম খণ্ড) ৮০৲ (২য় খণ্ড) ৮০৲

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
ভারত সংস্কৃতি (প্রবন্ধ) ৩৫৲

মোহিতলাল মজুমদারের
প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭০৲

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য ৪০৲

অমিতাভ চৌধুরীর
ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য প্রসঙ্গ ৩৫৲

ভ্রমণ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
ভ্রমণ অমনিবাস (৫ম) ১০০৲ দুধওয়া ২০৲
ধেয়ানের আলোক রেখা (স্মৃতি কথা) ২৫৲

শঙ্কু মহারাজের
কাশীখণ্ড ৫০৲ হিমালয় (৩য় খণ্ড) ৯০৲

ছোটদের বই

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের
দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র
প্রথম খণ্ড ॥ ৭৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ৪০৲

নবনীতা দেবসেনের
স্বপ্ন কেনার সদাগর ২০৲

মীরা বালসুব্রমনিয়নের
জগৎ জুড়ে রূপকথা ১৫৲

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের
অলৌকিক ইমন ও ক্বিন্টুর কীর্তিকলাপ ২৫৲

নাটক

উৎপল দত্তের
নাটক সমগ্র (১ম) ১০০

মনোজ মিত্রের
নাটক সমগ্র (১ম) ৮০৲

রচনাবলী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
আশুতোষ রচনাবলী ২টি খণ্ড—১৬০৲

বিবিধ

সাদাত আলী আখন্দ-এর ১৩ নং লর্ড সিন্‌হা রোড ৩০৲
মনতোষ রায়ের—যোগ ও জীবন ৪০৲

আনন্দ অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিন



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সমগ্র ১৮ টি উপন্যাস
একটি গিফ্‌ট বাক্সে

উপন্যাস সমগ্র ৩০০৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
ভ্রমণকাহিনী সম্পূর্ণ ৫ খণ্ডে

ভ্রমণ অমনিবাস

৪১০৲



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ✱ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ ✱ ফোন ৩১-৬৪২০/৩১-৪৪৩১

কথাসাহিত্যের

আগামী কার্তিক সংখ্যা

শারদীয়া সংখ্যা রূপে

পূজার পূর্বেই
প্রকাশিত হবে।

বাংলা সাহিত্যের সেরা কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, ভ্রমণকাহিনীকার ও কাব্যদের রচনায় সমৃদ্ধ, ত্রিবর্ণ চিত্র সমন্বিত, সুশোভন মুদ্রিত এই সংখ্যাটির দাম হবে ছত্রিশ টাকা।

এই সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৬·০০

কার্যালয়ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

কথাসাহিত্য

Vol. 45 No. 12 September 1994
৪৫ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা আশ্বিন ১৪০১

সূচীপত্র

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ৪·০০। সডাক বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৬৬·০০

কার্যালয় : কথাসাহিত্য, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, ফোন : ৩১৪৪৩১, ৩১৬৪২০

Office : Katha Sahitya, 10 Shyama Charan De Street, Calcutta-73, Phone : 314431, 316420



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জন্মশত বর্ষে

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখকের প্রকাশিত সকল গ্রন্থ :
পথের পাঁচালী ৪০ ৲ পথের পাঁচালী (পেপার-ব্যাক) ২২ ৲ অপরাজিত ৬০ ৲ অপরাজিত (পেপার ব্যাক) ৪০ ৲ ইছামতি (পেপার ব্যাক) ২৮ ৲ আরণ্যক ৩৫ ৲ আরণ্যক (পেপার ব্যাক) ২৪ ৲ অভিযাত্রিক ২২ ৲ মেঘমল্লার ২৫ ৲ দেবযান ৩৫ ৲ দৃষ্টিপ্রদীপ ২৮ ৲ অনুবর্তন ২৫ ৲ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৩০ ৲ অথৈ জল ৯ ৲ অশনি হীরা মানিক জ্বলে ২৪ ৲ সংকেত ২০ ৲ দুই বাড়ি ১৫ ৲

পথের পাঁচালী হীরকজয়ন্তী সংস্করণ ১০০ ৲



'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের পর ষাট বৎসর কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে চিত্রকর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পূর্ণ গ্রন্থটি চিত্রায়িত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সেইসঙ্গে 'পথের পাঁচালী' রচনার খসড়া পাণ্ডুলিপির সন্নিবেশ এবং সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় 'পথের পাঁচালী'র অনুবাদ প্রকাশের তথ্য ও এই বিখ্যাত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীদের সুদীর্ঘ আলোচনা বইটির বাড়তি আকর্ষণ।

বিভূতিভূষণের সমস্ত স্মৃতিকথা বা দিনলিপির একত্র সংকলন

দিনের পরে দিন

সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি :
অভিযাত্রিক, স্মৃতির রেখা, তৃণাঙ্কুর, উর্মিমুখর, বনে-পাহাড়ে, থলকোবাদে এক রাত্রি, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও।



॥ প্রকাশিত হল ॥

বিভূতি-জন্মশতবর্ষে
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের শ্রদ্ধার্ঘ্য
বিভূতি স্মারক সমিতির সম্পাদনায়

বিভূতি রচনাবলী প্রথম খণ্ড ॥ ১৫০ ৲

এই খণ্ডে :
পথের পাঁচালী, মেঘমল্লার, অভিযাত্রিক, চাঁদে পাহাড়, বিবিধ সংগ্রহ, গল্প লেখার গল্প, পত্রাবলী, পথের পাঁচালীর খসড়া ও বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়।

ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা-শোভন প্রচ্ছদে প্রকাশিত।

যাঁরা ১২০ টাকা অগ্রিম জমা দিয়েছেন তাঁরা ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম খণ্ড অবশ্যই সংগ্রহ করুন।

বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র

বিভূতিভূষণের ২২৩টি গল্প পৃথক দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

দু'খণ্ড ॥ ২৭০ ৲

এখন দুটি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে

বিভূতিভূষণের সমগ্র উপন্যাস একত্রে

উপন্যাস সমগ্র

লেখকের সমগ্র আঠারোটি উপন্যাস একত্রে তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড যথাক্রমে প্রথম খণ্ড ৮০, দ্বিতীয় খণ্ড ১০০ ৲ তৃতীয় খণ্ড ১২০ ৲

জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হচ্ছে
বিভূতিভূষণের পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা

লেখকের পত্নী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছেন এক অমূল্য সম্পদ

কাছে থেকে দেখা

যে কোনও লেখককে ঘনিষ্ঠভাবে চেনা জানার লোক বেশী হয় না। তার উপর সেই লেখক যদি হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মরমী কথাশিল্পী তখন স্বভাবতই লেখকের জানা চেনা মানুষগুলিও আমাদের কাছে দামী মানুষ হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁরাই তো বলতে পারেন, নিকটজন শিল্পীমানুষটির দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছু তথ্য যা অজানা থাকে পাঠকের কাছে। বইটি সেই কৌতূহল মেটাবে বিভূতি-পাঠকদের আর ভবিষ্যৎ গবেষণার আকর হয়ে থাকবে বিভূতি-গবেষকদের কাছে। পঁয়ত্রিশ টাকা।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭৩ • ফোন : ৩১৪৪৩১/৩১৬৪২০

কথাসাহিত্য

৪৫ বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

আশ্বিন ১৪০১

পথে ও পথের প্রান্তে

'আশ্বিনের মাঝামাঝি / উঠিল বাজনা বাজি / পূজার সময় এলো কাছে'—এই পংক্তি কয়টি আগে মনে যে আনন্দ যোগাইত আজকাল তা পাই না। না পাওয়ার দোষ নিজের ওপরই প্রথম চাপানো ভালো—কারণ মধু-বিধুর বয়স কবে পার হইয়া আসিয়াছি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের ও মনের রঙ-ও হারাইয়াছি। তবু স্মৃতি খুব বেশী প্রতারণা করিলেও একটি কথা সকলে স্বীকার করিবেন, এখন পূজার সময়ে যে সব নিত্য অশান্তি দেখা যায়, সে সবের সহিত বাল্যে বা কৈশোরে আমাদের পূর্বপরিচয় ছিল না। বোনাসের জন্য মিছিল, অতিরিক্ত দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট, মালিকের কল-কারখানা লক-আউটের হুমকি, পূজার প্রাক্কালে দরিদ্র মধ্যবিত্তের সামনে চাকুরি হারাইবার ও বেতন বন্ধের বিভীষিকার সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম না। মানুষের সহিত মানুষের প্রীতির সম্পর্ক ও মেলবন্ধন যাহা এইসব অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল, এবং এখনও থাকার কথা, পূজার প্রাক্কালের দাবী-দাওয়া ও হুম্‌কির মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।। ইহায় সহিত আছে রাজনীতির নানা ফ্যাকড়া লইয়া অশান্তি, ধর্মান্ধতার কারণে অশান্তি—এইগুলিও মাথা চাড়া দিয়া দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এক অশান্তির আগুনের সহিত আর এক অশান্তির আগুন জড়াইয়া যে জটিল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা নিরাকরণ করিবার মতো সামাজিক বা রাজনৈতিক চিকিৎসক একালে দুর্লভ। ভোগে সেই দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষ—অর্থকৃচ্ছ্রতা ও মূল্যবৃদ্ধির নিপীড়নে দুর্বিষহ জীবনযাপন করিতে যাহারা বাধ্য হয়। ইহার বিপরীত চিত্র যে নাই তাহা নয়, তাহাও পাওয়া যায় অন্যত্র। রেলের রিজার্ভেশনের ভিড়ে, এ রাজ্যে ও ভিন্ রাজ্যে বেড়ানোর ও থাকার জায়গার স্থান না পাওয়ার তথ্যে অথবা ভ্রমণার্থীদের সংখ্যাধিক্যে হয়তো অনেকে আসন্ন পূজার আনন্দচিত্র খুঁজিয়া পাইবেন, কিন্তু সমগ্র বাঙালী জনসংখ্যার তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। সমগ্র ভারতের হিসাব ধরিলে আরও কম। পূজার আনন্দ যে সকলকে লইয়া এই বোধ আমরা দ্রুত হারাইতেছি। নিজ পরিবার,

নিজ গোষ্ঠী অথবা নিজ সংগঠন ইহার বাহিরে চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই। মহারাষ্ট্রে বিগত ভূমিকম্পের সময়ে একটা কথা উঠিয়াছিল, দুর্গাপূজার আড়ম্বর ও আলোকসজ্জা বন্ধ রাখিয়া খরচের বড় অংশ ভূমিকম্পে দুর্গতদের সেবায় দেওয়া হইবে। দুর্গতদের সেবায় কত দেওয়া হইয়াছিল সে তথ্য পাই নাই, কিন্তু আড়ম্বর বা আলোকসজ্জায় বড় কেহ পিছাইয়া ছিলেন না। আসলে আমাদের মধ্যে বাঙালী হউক বা ভারতীয় হউক, চরিত্রগত মিশনারী দৃঢ়তার বড় অভাব আছে, যাহা ইউরোপীয় জাতিচরিত্রে আমরা অহরহ দেখিতে পাই। আবেগ বা ঝুঁকিতে কোন কাজ করা আটকায় না আমাদের, কিন্তু যত বড় সৎকাজই হউক, সে আদর্শ ধরিয়া রাখা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কথার সহিত আচরণের সাদৃশ্য থাকে না। এইজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজে হিন্দু-মুসলমান একত্র মিলিয়া যুদ্ধ করার পরও সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ ভাগ হয়, এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অগণিত লোক মরিবার পরও মৌলবাদীদের কথায় আবারও উত্তেজিত হই। পরস্পরকে দেখিবার ও সহযোগিতার পবিত্র প্রতিশ্রুতির পরও এক গোষ্ঠীর সহিত আর এক গোষ্ঠীর প্রাণঘাতী বিবাদ বাধে। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতেরই এই এক চিত্র। অথবা সমগ্র ভারত উপমহাদেশেই এই চিত্র। এই কারণেই গোড়ায় লিখিয়াছিলাম, আশ্বিনের মাঝামাঝি যে আনন্দ পাইতাম সে আনন্দ আর পাই না। শারদীয়ার আগমনীতে একটি প্রার্থনাই আজ মনে আসে—'মা, তুমি আসিবার সঙ্গে আগের দিনগুলিও ফিরাইয়া আনো, আর দেশের মানুষগুলিকে সুবুদ্ধি দাও।' সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করে—সা নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

বন্ধুবিয়োগ

পূজার প্রাক্কালে কথাসাহিত্যের গোষ্ঠীর দুই শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ ও সাহিত্যরসিক মানুষকে আমরা হারাইলাম। কবি প্রাবন্ধিক অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের সহিত আমাদের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘকালের—কথাসাহিত্যের জন্মলগ্ন হইতে। পরিচয় অবশ্য তাহারও আগে হইতে যখন হরপ্রসাদবাবু সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হইয়াছেন। হরপ্রসাদবাবুর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ কথাসাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সৌম্যদর্শন ভদ্র বিনয়ী মানুষটি তাঁহার অন্তরঙ্গ ও অমায়িক ব্যবহারের গুণেই সাহিত্যরসিক ও ছাত্রসমাজের কাছে আদরনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা আত্মীয়বিরহব্যথা বোধ করিতেছি।

*　　*　　*

তুষারকান্তি ঘোষ পরিণত বয়সে বিদায় লইলেও, হাসি ঠাট্টা আড্ডাপ্রিয়তা লইয়া এমন এক সজীবতার প্রতিমূর্তি ছিলেন যে তাঁহার অভাব বিদগ্ধ সমাজে নানা প্রসঙ্গেই অনুভূত হইবে। তাঁহার আড্ডাপ্রিয় রঙ্গরসিকতা জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের উচ্চতম আমলাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এক বাঙালী নেটিভ সম্পাদকের আলাপ-আলোচনা কত উচ্চস্তরে উঠিলে এই ঘটনা সম্ভব হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই মানুষটির দ্বিতীয় আজ খুঁজিয়া পাওয়া বিরল। এক সংবাদপত্র সম্পাদকীয়ে যথার্থই বলা হইয়াছে, তুষারবাবুর তিরোধানের অর্থ সত্যই একরূপ বনস্পতির বিদায়।



পাঠকের চিঠি

॥ ১ ॥

[লেখকের উত্তর]

মাননীয় "কথাসাহিত্য" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :

মান্যবরেষু,

শ্রাবণ (১৪০১) সংখ্যায় ইতিপূর্বে "কথাসাহিত্যে" প্রকাশিত আমার এক প্রবন্ধের সূত্র ধরে অধ্যাপক প্রসিত রায়চৌধুরী মহাশয়ের যে পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

জিন্না সম্বন্ধে প্রসিতবাবু যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা হলে বলার কিছুই নেই। তবে স্বাধীনতা-পূর্বকালে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রচারিত জিন্নার এই আত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি যে পরবর্তীকালে গবেষকদের কাছে লভ্য দলিলদস্তাবেজের সাক্ষ্যে বিকৃত ও অর্ধসত্য প্রমাণিত হয়েছে সেকথা ভারতের আধুনিক ইতিহাসের পাঠকেরা জানেন। কিন্তু সে দীর্ঘ প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে করব না, কারণ এ সম্বন্ধে পূর্বেই আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি।

আমার প্রথম বক্তব্য : "গান্ধীজীই আবার তাঁকে (জিন্নাকে বিলাত থেকে) ফিরিয়ে আনেন", এই উক্তির সমর্থনে তিনি কোন তথ্য দেননি। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে এ কৃতিত্বের দাবিদার তিনজন—আসামের আবদুল মতিন চৌধুরী, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ ও তাঁর বেগম-সাহেবা। প্রথমোক্তজন বার বার চিঠিতে এবং অপর দুজন বিলাতে গিয়ে বহু পীড়াপীড়ি করে তাঁকে ভারতে ফিরতে অনুপ্রাণিত করেন।

দ্বিতীয়তঃ আমার উক্ত প্রবন্ধের এক উক্তির (পাকিস্তান হাসিল হবার পর জিন্না স্বয়ং দ্বিজাতি-তত্ত্ব বাতিল করেন) সমর্থন করে তার কারণ হিসাবে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু বাঙালীদের পৃথক এক রাজ্যের দাবির ভয়ের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এটা তাঁর ধারণা বলে এ নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে চাই না, যদিচ এর সমর্থনে পূর্ববৎ তিনি কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পেশ করেননি। কিন্তু পাছে আমার উক্তির অপব্যাখ্যা হয় সেইজন্য কেবল এইটুকু যোগ করতে চাই যে আমার মন্তব্যের ভিত্তি ছিল ভিন্ন। জিন্না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে (কোন ভয়ে নয়, তখন তিনি পাকিস্তান অর্জনকারী বিজয়ী বীররূপে বন্দিত) দ্বিজাতি-তত্ত্বকে নাকচ করেন পাকিস্তান হাসিল হবার পরই (কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই) ১৯৪৭ খ্রী ১১ই আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের কাছে তাঁর বিখ্যাত প্রথম বক্তৃতায়। সেই গুরুত্ব-পূর্ণ বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আপনারা স্বাধীন। এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে আপনাদের ইচ্ছামত মন্দির মসজিদ অথবা অপর যে কোন উপাসনাস্থলে যাবার অধিকার আপনাদের আছে। আপনাদের ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় যাই হোক না কেন, তার সঙ্গে এই মূলনীতির কোন সম্পর্ক নেই যে আমরা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী। আমার মতে এই নীতিকে আমাদের আদর্শরূপে সদাজাগরুক রাখা আমাদের কর্তব্য। তাহলে আপনারা দেখবেন যে কালক্রমে হিন্দুরা আর হিন্দু এবং মুসলমানরা আর মুসলমান থাকবে না—ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে নয়, কারণ সেটা হল প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রশ্ন—এ হল রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।"

শ্রদ্ধা ও নমস্কারান্তে—

বিনত

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ-বিবেচনা

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রসাহিত্য এক অপার সাগরবিশেষ। এর নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। একই বিষয়ের উপর একাধিক গবেষক ও সাহিত্যিকের আলোচনার উদাহরণও কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্যের স্থান সম্পর্কিত সমালোচ্য গ্রন্থটির গবেষক-লেখক কেবল তাঁর মনোনীত বিষয়ের অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের জন্যই এক্ষেত্রে পথিকৃৎ আখ্যা পাবার উপযুক্ত। তবে বলা বাহুল্য প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ পালের পি. এইচ. ডি- ডিগ্রি লাভের গবেষণার পরিণাম এই গ্রন্থ কেবল সেই কারণেই একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি নয়। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের গবেষণাকার্যের তত্ত্বাবধায়ক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নীলরতন সেন যথার্থই বলেছেন, "রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক এতকাল প্রায় উপেক্ষিত, অথচ কবির শিল্পমানসের বিচারে বিশেষ জরুরী একটি মৌলিক বিষয়ের উপর সুগ্রথিত, মননশীল আলোচনার মাধ্যমে লেখক নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন।"

যদিও ডঃ সেনের ভূমিকার পূর্বোদ্ধৃত একটি বাক্যই এই মৌলিক গবেষণাগ্রন্থের পরিচয় দেবার পক্ষে যথেষ্ট, তবু লেখকের কৃতির আর একটু বিশদ আলোচনা না করলে এই মূল্যবান গ্রন্থটির প্রতি অবিচার করা হবে। আমরা তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের দুরবগাহ পাথারে ডুব দিয়ে শ্রীযুক্ত পালের মত গৌড়জনের জন্য অমূল্য মৌক্তিকগুচ্ছ সংগ্রহকারী গবেষক-লেখকের এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি দিকের উল্লেখ করব। কবিগুরুর জীবনে ভৃত্যের ভূমিকা অনুসন্ধান করেছেন লেখক নানা স্তরে। এগুলি হল "শক্তিমান রাজভৃত্য" যাদের দর্শন মেলে মূলতঃ তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলীতে। অতঃপর "জমিদারের দেওয়ান বা ম্যানেজার", যাঁদের অমাত্য পর্যায়ে ফেলা চলে। তৃতীয় পর্যায়ে আছে "ভক্তিমতী দাসী" চরিত্র, যাদের আবির্ভাব ঐতিহাসিক নাটক বা পূজারিণী জাতীয় কাহিনী কাব্যে। চতুর্থ পর্যায়ের গৃহভৃত্যরা "কেষ্টার" কল্যাণে সর্বজনপরিচিত, যদিও ও-জাতীয় ভৃত্যের আদর্শ উদাহরণ "রাইচরণ" (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) বা "বনমালী" (শোধবোধ)-এর মত বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। "প্রহরী ও দেহরক্ষীরা" অপর এক শ্রেণীর ভৃত্য। এছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্য জুড়ে আছে মালী, দূত, গুপ্তচর, বিদূষক, কঞ্চুকী, মন্দিরের সেবক (জয়সিংহ) প্রমুখ অসংখ্য ভৃত্যচরিত্র— কবিতা ও কাহিনীর প্রয়োজনে স্রষ্টাকবি যাদের আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন। লেখকের বাহাদুরি কেবল তাবৎ ভৃত্য-চরিত্রকে রবীন্দ্রসাহিত্য মন্থন করে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা নয়, সংস্কৃত-গ্রীক্-ইংরাজী সাহিত্যের অনুরূপ চরিত্রসমূহের সঙ্গে তাদের তুলনামূলক অধ্যয়নও। এ গবেষণাগ্রন্থ যে তাঁর দীর্ঘকালের অধ্যয়ন-মনন-চিন্তনের ফল এতে সন্দেহের তিলমাত্র কারণ নেই।

লেখক দীর্ঘ ভূমিকা অধ্যায়ে গ্রন্থের সার বর্ণনা করার পর আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য-নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ডায়েরী— এক কথায় সমগ্র রচনাবলী থেকে তাবৎ ভৃত্য চরিত্রদের তাদের সর্ববিধ চারিত্রবৈশিষ্ট্যসহ পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত করেছেন প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলির মাধ্যমে। লেখকের বিস্তারিত প্রয়াসের কারণ এ গ্রন্থ রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্যের এনসাই-ক্লোপেডিয়া আখ্যা পাবার উপযুক্ত। উপসংহার অধ্যায়ে লেখক এইসব চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সানুকম্প সংবেদনশীল মানসিকতার উপর আলোকপাত করেছেন, যা তাঁর মানবতামূলক চরিত্রমাহাত্ম্যের অভিপ্রকাশ। রবীন্দ্র-

নাথের সৃষ্টি-পরিক্রমা সমাপ্ত করে স্রষ্টার মানসলোকের সমীক্ষা করেছেন সৃষ্টির উৎসমূলে উপনীত হবার জন্য। ভৃত্যচরিত্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার মত লেখককৃত এই বিশ্লেষণও সমান মূল্যবান।

নিঃসন্দেহে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত পাল রবীন্দ্রসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নূতন মাত্রার সংযোজন করেছেন। তাঁর এই অভিনব প্রয়াস এক স্থায়ী সারস্বত কৃত্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রেমীদের কাছে অবশ্য পাঠ্যরূপে বিবেচিত হবে।[১]

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

বেশ নজরকাড়া প্রচ্ছদ। উর্ধ্বমুখী এক নারী। চেয়ে আছে অনন্ত শূন্যের পথে। খোলা চুলের ভিতর লেখা কাব্য ও কবির নাম। 'স্বাগতা স্বপ্নের সোপান' ও 'গৌতম চট্টোপাধ্যায়'। তেইশটি কবিতা সম্বলিত বইটি একঝলকে দেখলে মনে হবে যেন ছোটদের ছড়ার বই। কিন্তু পাতা ওল্টালেই সেই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। কবিতাগুলির শরীরে জড়িয়ে আছে প্রেম। শুধু প্রেম নয়, শরীরী প্রেম। তন্ত্রতত্ত্ব। আর কবির ছেলেবেলা-শৈশব। কবিতাগুলি অনেকটা অঙ্কের মত। সিঁড়িভাঙা অঙ্ক যেন। কবি একটির পর একটি সোপান তৈরি করেছেন। শব্দের সোপান। স্বপ্নের সোপান। তাই বোধহয় কাব্যের নাম হয়ে যায় 'স্বাগতা স্বপ্নের সোপান'। কবি লিখছেন, "কিশোরীরা বিবর্ণ পুরুষদের কোন চিঠি দিয়ে যায় না···মধ্যগ্রীষ্মে তারা অসংখ্য একা হয়ে থাকে···কিশোরীরা সেই সন্ধিক্ষেত্রে নতুন চিঠি নিয়ে আসে।" (চিঠি) 'কুমিরডাঙা খেলায়' অথবা 'বোশেখ' কবিতায় কবি চলে যান তাঁর ফেলে আসা স্বপ্নের কৈশোরে। তাই কবি উচ্চারণ করেন—"নীতিবোধের অসুখ আমাকে চরম মুহূর্ত থেকে / ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে বারবার" অথবা "আটাত্তরের বৃষ্টিতে শিল কুড়িয়েছে হাফ্ প্যান্ট আর ফ্রক"। কবির আত্মস্বীকারোক্তি, কবির প্রেম, কবির 'উন্মাদ অসুখ' আমাদের ভারাক্রান্ত করে। 'কিশোরী ঘাস', 'টর্চের তীর', 'বায়বীয় চোখ', 'ভরাট যুবক' ইত্যাদি পড়তে ভালো লাগে। "এভাবেই বয়সেরা মানুষ বাড়িয়ে তোলে"—কবির দর্শন আমাদের কাছে ধরা পড়ে। কবি লিখছেন, "মূলাধারচক্রে ঠোনা দিতেই যেন শতাব্দী খসে পড়ল।" আবার যখন পড়ি "ভালবাসা যদি ভুল হয় / সাড়া দিও জজ্যার ডাকে" অথবা "কেউ কেউ নাভিকুণ্ড খোঁজে" কিংবা "মরসুম সন্ধানী যুবতীরা প্রখর গ্রীষ্মেও আতপনিয়ন্ত্রিত" প্রেম, শরীর, দর্শন তখন একাকার হয়ে ধরা দেয় আমাদের কাছে। ছন্দের হাত আরো নির্ভুল হতে হবে। কবিতার শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত দুই বা এক লাইনে মূল কথা বলার প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। কবিতায় তো কিছু অব্যক্ত রাখতেই হয়, যা পাঠক বুঝে নিতে পারে। মুদ্রণপ্রমাদ ও বানান সম্পর্কে আরো সচেতন হতে হবে। সাম্যব্রত জোয়ারদারের প্রচ্ছদ এককথায় অপূর্ব।[২]

অরুণ মুখোপাধ্যায়

১। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্যের স্থান ও মানবতাবাদ—রামপ্রসাদ পাল। দে বুক স্টোর, ১৩নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩।

২। স্বাগতা স্বপ্নের সোপান / গৌতম চট্টোপাধ্যায় / মণিকুন্তলা, ১১৭/১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রতিস্থাপন

প্রদীপকুমার ভাদুড়ী

ফোনটা ক্রেডলে নামিয়ে তাকালাম হিমাংশুর দিকে।

বিধ্বস্ত, ঝোড়ো চেহারা, রুক্ষ চুল উসকোখুসকো। গায়ে ময়লা একটা হাফশার্ট। ময়লা পায়জামা। উদ্বেগ আর রাত্রি জাগরণের চিহ্ন চোখে।

বললাম—কি ব্যাপার তোর? কি হয়েছে?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রুমাল বার করে চোখ মুছে বলল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রাজীব।

এমনিতেই সেন্টিমেন্টাল হিমাংশু, আবেগপ্রবণ। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব—হ্যাঁ, তা প্রায় তিরিশ বছর। ইস্কুল থেকে। তারপর কলেজ। নাইনটিন সিকটিফোর। বি. এ. পাস করলাম একসঙ্গে, জগদ্দলের একটা জুটমিলে টাইম-কিপারের চাকরি পেল, কোন্নগরে বিয়ে করল। ওর স্ত্রী নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সংসারী মেয়ে। বললাম—হাউ হাউ করে কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে বলবি তো? ধমকানি খেয়ে ধরা-গলায় হিমাংশু বলল—পরশু থেকে আমার মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কি রে?

ফোনটা বাজল। উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম। ডাঃ ব্যানার্জীর ফোন। ক'দিন থেকে বিথির লাম্বারে পেন, টেম্পারেচার, হাঁটাচলায় অসুবিধে, ইউরিনে ব্লাড আসছে। ইউরোলজিস্ট ডাঃ ব্যানার্জী বললেন—মিঃ মিত্র, টেস্টের রিপোর্টগুলো পেলাম। ভালো না। একবার আসতে পারবেন সন্ধ্যেবেলা?

ধক্ করে উঠল বুকটা। শরীরের ভিতরে ঠাণ্ডাস্রোত। কোনরকমে বললাম—নিশ্চয়ই যাবো, ডাঃ ব্যানার্জী।

—থ্যাক ইউ।

—এক মিনিট। কি সন্দেহ করছেন?

—একটু ডেফিনিট হয়ে নিই। আপনি আসুন না।

—বেশ।

ফোন নামিয়ে রাখলাম, মনটা দুশ্চিন্তায় খিঁচিয়ে গেল। হিমাংশুর দিকে তাকালাম—হ্যাঁ, কি বলছিলি?

হিমাংশু উদ্বিগ্ন গলায় বলল—কি হয়েছে? বিথির কিছু?

—বুঝতে পারছি না। ইউরিনে ব্লাড আসছে। যাকগে, তোর ব্যাপারটা বল!

হিমাংশু গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল—কাল কলেজ থেকে বাড়ি ফেরেনি রূপা, আমার মেয়ে।

—সে কি রে! বিস্মিত হলাম, রূপাকে আমি চিনি, বড় ভালো মেয়ে। ১৮/১৯ বছর বয়স। কলেজে পড়ে।

দশ বছর হল জুটমিলে ক্লোজার, চাকরি নেই হিমাংশুর। দুটি মেয়ে আর বৌ, বাড়িভাড়া—এই বাজারে নির্দিষ্ট রোজ-গারের ব্যবস্থা না থাকলে! আগেই বলেছি, সেন্টিমেন্টাল হিমাংশু। না ডাকলে সচরাচর আসে না।

পৈতৃকসূত্রে এই ব্যবসা, বাড়ি গাড়ি, এই আভিজাত্য-পূর্ণ জীবন। এখানে হিমাংশুর মত সাদামাটা, নিম্নমধ্যবিত্ত বন্ধু—ব্যাপারটা অনেকের কাছে আশ্চর্যের বৈকি! আমি বুঝি, ওর সেন্টিমেন্ট আমাদের সম্পর্ক টেনে রেখে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত কখনও হাত পাতেনি। আমার এক ক্লায়েন্টের অফিসে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। ওই সামান্য টাকাতেই কষ্টে সংসার চালায়। কখনও বলেনি, মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দিতে বল, রাজীব!

বিথির সোসাল কন্ট্যাক্ট ভালো। গত কয়েক বছর একটা নতুন ব্যাপার অভিজাত সোসাইটির কিছু অংশে ঢুকে গেছে। প্রোগ্রেসিভ আউটলুক তৈরী হয়েছে। বিশেষ করে সত্যজিৎ, রবিশঙ্কর, মকবুল ফিদা হোসেন, বিকাশ ভট্টাচার্য—ফোক্ কালচারের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। সাধারণত এ সমস্ত ব্যাপারে আমার আগ্রহ কম। কন্ট্যাক্ট কম। বিথিই এ সমস্ত করে। নন্দন—সোসাইটির কালচারাল সেণ্টার হিসেবে ঢুকে যাচ্ছে। আগের মত ক্যালকাটা ক্লাব, ডগশো—এ সমস্ত আর সবাইকে টানে না। সাধারণত যেদিন বাইরের এনগেজমেণ্ট কম থাকে—ড্রয়িংরুমে আমি

আর বিথি—ড্রাঙ্ক হওয়া ছাড়া কিছু করার থাকে না। মাঝে একটা অবজেক্ট দরকার হয়ে পড়ে। এই সমস্ত সময়ে হিমাংশুকে ডাকি ফোনে, চলে আয়। ক্লায়েন্টের অফিস থেকে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসে হিমাংশু।

আমার পারিবারিক ব্যবসা। কয়েক পুরুষ ধরে সঞ্চিত অর্থ। সমস্যা শুধু খরচের। আমি খানিক কুনো, তাছাড়া যাকে বলে ইকোনমি—হুড়হুড় করে টাকা খরচ করে খানিক প্লেজার কেনা—ঠিক হয়ে ওঠে না। ব্যবসা-টাকা আর বাড়ানোর এনার্জি নেই। এই ঠিক আছে—একটা নিয়ম। এখন ফরটিএইট। অনেক প্রভোকেশন থেকে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়। বিথি অবশ্য ঠিক উল্টো।

হিমাংশুকে ডাকি। একটু পেটে পড়লেই ড্রাঙ্ক হয়ে পড়ে ও। ওই সময় ও খুব ওবলাইজড হয়ে পড়ে। আমাদের বন্ধুত্ব তারিফ করে। বার বার প্রশংসা করে আমাকে। একদিন ও বিথিকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল। শালা, রাস্কেল, সোয়াইন বলে কলার ধরে ঝাঁকানি দিতে সম্বিতে ফিরে বলল—রাজীব আমায় মারলি, আমি কিন্তু—

—শালা, কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে! গেট আউট—ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিলাম। বিথির দিকে তাকিয়ে বললাম—ডোণ্ট মাইণ্ড, বিথি!

পরদিন সকালে দারোয়ান বলল—একঠো লেড়কি আপকে সাথ মোলাকাত করনে অয়ী।

স্টাডিতে ছিলাম, বললাম—ইধর ভেজ দো।

"কাকু, আসবো?" তাকিয়ে দেখি আঠেরো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে। শান্ত সৌন্দর্য আর এত নম্র মিষ্টি কথা! দেখেই ভাল লাগল, বললাম—কে তুমি?

—আমি রূপা, আমার বাবা হিমাংশু বসু।

—আরে! এত বড় হয়ে গেছো তুমি! এসো, বসো।

—বাবা কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।

—অ্যাঁ, সে কি! কালকের কথা মনে পড়ল। লজ্জা লাগল, আতঙ্ক লাগল একটু। ইস্, অতোটা না করলেই হত! ড্রাঙ্ক হলে মানুষ একটু এলোমেলো হয়, নিজেদের স্ট্যাটাসের লোক হলে কিছু বলা যেত। হিমাংশু আধা বেকার, নানান সমস্যায় আছে। সেন্টিমেণ্টাল। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। মনে হল বন্ধুত্বকে এক্সপ্লয়েট করলাম। বিথি সেই সকালেই সোশাল ওয়ার্কে বেরিয়েছে। রামধনিকে বললাম—ব্রেকফাস্ট লে আও। শান্ত, বাধ্য মেয়ের মত, না খেলে অন্যায় হবে, রূপা তাই যেন খেল। সংসারের কথা, ওর নিজের কথা জিজ্ঞেস করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বললাম—'তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও। আমি দেখছি।' গাড়ি করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম।

তাই হিমাংশু যখন রূপার বাড়ি না ফেরার কথা বলল, অবিশ্বাস্য মনে হল। নিজে থেকে কোন প্রভোকেশনে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মেয়ে ও নয়। বললাম—থানায় ইনফর্ম্ করেছিস?

—হ্যাঁ, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, সব জায়গায় খোঁজ করেছি।

—চল দেখি।

ব্যবসার খাতিরে আমার প্রভাব আছে লালবাজারে। মিসিং পার্সন্স্ স্কোয়াড, টিভি, রেডিও, প্রেস তোলপাড় করলাম। কোন খবর পাওয়া গেল না। দিন অতিবাহিত হতে লাগল। ক্রমশ রূপা মুছতে শুরু করল। শুধু যখন হিমাংশু পাথর-মুখে সামনে এসে দাঁড়ায়, সান্ত্বনা দেওয়ার থাকে না, বিড়ম্বনা অনুভব করি।

বিথির টোটাল চেকআপের পর ধরা পড়ল রেনাল ফেলিওর। ডাক্তার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট সাজেস্ট করল। সাউথের এক বড় নার্সিং হোমে কনট্যাক্ট করলাম। আধুনিক প্রযুক্তি আর চিকিৎসা বিজ্ঞান শুধুমাত্র নতুন প্রাণের সৃষ্টি করতে পারে না—ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তাও যেন প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল।

আমি এখন বিথিকে নিয়ে ওর ট্রিটমেণ্টের জন্যে প্রচণ্ড ব্যস্ত। আমার এক ক্লায়েণ্ট ফোন করল একদিন—মিঃ মিত্র, ডোনার পেলেন?

—না রে ভাই, একটা অ্যাড দিতে হবে।

—ভাববেন না, ডোনার পাওয়া যাবে। ব্লাড গ্রুপটা দিতে হবে।

সুরানা নামে এক ছোকরাকে আমার ক্লায়েণ্ট পাঠালো। সে এসে সমস্ত ডিটেল্স্ নিয়ে গেল। পরের দিন ফোনে বলল—মিঃ মিত্র, সব ঠিক আছে। পঞ্চাশ হাজার লাগবে। কোথায় করাবেন?

—সাউথে। আমি নার্সিং হোমের নাম করলাম।

—হ্যাঁ, ঠিকই আছে। তবে হাজার পাঁচেক বেশী

লাগবে গাড়িভাড়া বাবদ, রাজী ?

—হ্যাঁ, ডোনারকে নিয়ে আসুন।

—সে আনা যাবে না। আপনি নার্সিং হোমে কন্ট্যাক্ট করুন। ডেট নিন। ডোনার ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে।

বিথিকে নিয়ে কালাপাক্কাম এয়ারপোর্টে নেমে নির্দিষ্ট হোটেলে উঠলাম আন্নামালাই রোডে। পরদিন সকাল ন'টায় নার্সিং হোমের গেটে সুরানার সঙ্গে দেখা। বললাম—ডোনার রেডি ?

—হ্যাঁ।

—চল, কথা বলি।

সুরানা মাথা নাড়ল—সরি, মিঃ মিত্র। একদম ট্রান্সপ্লান্টের দিন জানতে পারবেন। আপনি কোন কথা বলবেন না। যা বলার আমি বলব। ঠিক আছে ?

বললাম—তা কেন ? এত গোপনের কি আছে ? লুকোচ্ছেন কেন ?

সুরানা সিরিয়াস মুখে বলল—বিজনেস। কিছু জানতে চাইবেন না, মিঃ মিত্র।

সমস্ত ব্যাপারটাই ক্রমশ রহস্যময় হয়ে আসছে। আমার পারিবারিক বিজনেস কয়েক পুরুষের। সবকিছু স্মুথলি চলে না। সব ব্যবসাতে গোপন চলে, এ আমি জানি। সুরানা ডোনার সাপ্লাই করে। দালাল। কিন্তু সবটাই এত মিস্টিরিয়াস ! ওর গ্রিপে থাকা ! এত সহজে সব কিছু হয়ে যাবে, বিশেষ করে বিথিকে নিয়ে আমি যখন পাজল্ড !

হিমাংশু আমার সঙ্গে এসেছে। প্রয়োজন লাগতে পারে—বিশেষত কৃতজ্ঞতা-বোধ থেকে সব সময়েই আমার কিছু করার জন্যে উদ্গ্রীব। রূপার হারিয়ে যাওয়া মেনে নিয়েছে। এখন আর কিছু বলে না।

সুরানা চলে গেলে হিমাংশুকে বললাম—সমস্ত ব্যাপারটা খুব মিস্টিরিয়াস লাগছে, কি করা যায় বল্ তো !

হিমাংশু আমাকে অভয় দিল—এতদূর এসে, বিথির এই স্টেজে—তাছাড়া তোর ক্লায়েন্ট ভিয়ানি যখন মাঝে আছে, ওসব নিয়ে ভাবিস না রাজীব, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিথি হসপিটালাইজড্ হয়েছে। সব ঠিকঠাক। আগামীকাল ওর ট্রান্সপ্লান্ট। টেনসন থেকে রিলাক্স পাবার জন্যে পিটার স্কটের ছিপি খুললাম সন্ধেবেলা। আকণ্ঠ খেল হিমাংশু আর বার বার 'ডোণ্ট মাইণ্ড' 'ডোণ্ট মাইণ্ড'—তোর 'এই বিপদে'—'তুই আমার গ্র্যাণ্ড ফ্রেণ্ড রাজীব', 'আমি তোর কাছে গ্রেটফুল' এই সমস্ত বলতে লাগল।

ট্রান্সপ্লান্ট নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। ও. টি. থেকে বেরিয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে চেম্বারের দিকে চলে গেল সহকারী সার্জেন। চেপে থাকা উদ্বেগ একঝলক নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। যাক্, অন্ততঃ কয়েকটা বছর বিথিকে পাবো। ডোনারকে এখনও দেখিনি—যে আমার বিথির জীবন দান করল তাকে একবার দেখবো না ! বিশ্রী অপরাধ-বোধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে। পাশে হিমাংশু দাঁড়িয়ে। সুরানা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে রিল্যাক্স করছে। বললাম—ইনটেনসিভ কেয়ারে থাকো, কনট্যাক্ট কর। লোকটা বেশ চনমনে। চড়াক করে বেড়ালের মত লাফিয়ে উঠে ও-টির গেটে কথা বলে ডাকল আমাকে।

হিমাংশুকে বললাম—চল্, দেখে আসবি বিথিকে।

—তুই যা। আমার ওসবের মধ্যে কেমন আনইজি লাগে।

সুরানাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে গেলাম। বিথি শুয়ে, সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে। সেন্সলেস। মুখে অক্সিজেন মাস্ক। নানা ক্যাথেটার, পাইপ শরীরে কন্ট্যাক্ট করেছে। স্যাল্যাইন, রক্তের বোতল হ্যাঙ্গারে ঝুলছে। দেওয়ালে কম্পিউটারাইজড্ মেশিন—জলছে নিভছে, নানা ফিগার এক্সপোজ করছে। কোনটা বিপ্, বিপ্, শব্দ করছে। বিথিকে চেনা যায় না। মুখটা ফুলে গেছে। আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। বললাম—ডোনার কোথায় ?

আঙুল দিয়ে দুটো বেড পরে দেখালো সুরানা। সাদা চাদরে ঢাকা। একই অবস্থা বিথির মত। বছর বিশেকের একটা ছেলে। নিষ্পাপ অচৈতন্য রক্তহীন ফোলা মুখ। বিথির জীবনদাতা। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। সুরানা পাশে, জিজ্ঞেস করলাম—বাঙ্গালী ? কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছো ?

—হ্যাঁ। মুচকে হাসল সুরানা—মিঃ মিত্র, সব কিছু রেকর্ড করা আছে। আপনার চিন্তার কিছু নেই।

—কনসেণ্ট দিয়েছিল ছেলেটা ?

(শেষ অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়)

সুড়ঙ্গ

শচীন মুস্তফী

সোনালী সেন কিছুতেই চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছেন না। বিছানায় শুয়ে মাছের মত তাকিয়ে আছেন। দেখছেন না কিছুই। শুধু তাকিয়েই আছেন। ঘরে জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মাথার ওপর টিপ্ টিপ্ করে পাখাটা ঘুরছে। হাওয়া লাগুক, কি না লাগুক কিছু এসে যায় না। ওটা যে চলছে এই অনুভূতিটাই মনের মধ্যে কাজ করছে। জানলা দিয়ে ত্রয়োদশীর রূপোলী আলো মেঝের কার্পেটের ওপর চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। বাথরুমের কলটা দিয়ে বেশ কদিন টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। পালটাতেই হবে। দিনের বেলা মনে থাকে না। কিছুদিন ধরে দরজার পাল্লার ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে ভেসে আসছে। মনে হয় ঘুণ পোকা কুরে কুরে চলেছে। সব আলো বন্ধ করলে হয়তো কাজ হত। পারছেন না। ভয় পাচ্ছেন। হয়তো অন্ধকার গলা টিপে ধরবে। কত কত দিন ধরে সেই ভ্রূণ অবস্থা থেকেই হৃদয়ের স্পন্দন একই তালে চলেছে—অবিরাম। যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত।

সকালের ঘটনাটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না। বরং তুষারগোলকের মত ফুলে ফেঁপে অতিকায় হয়ে উঠছে। কেন গেলেন? না গেলেই তো পারতেন। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্নতায় চলে গেছিলেন। ফিরে এসে ভাবলেন সত্যি কি তিনি গেছিলেন? না দুঃস্বপ্ন? তাঁর এতদিনের বিশ্বাস ধারণা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সুখের প্রাসাদ যেন তাসের ঘরের মত এক দমকায় ধুলিসাৎ হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে উঠলেন। বাথরুমে গেলেন। হাতে পায়ে চোখে মুখে বেশ করে জল দিলেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফেললেন। ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে একটা কামপোজ মুখে দিয়ে ঢক ঢক করে জল খেলেন। আবার শুয়ে পড়লেন। চোখের পাতার ওপর হাতচাপা দিলেন। ভাল লাগল না। টর্কিশ তোয়ালে চাপা দিলেন।

মনের মধ্যে ভিডিও চলতে শুরু করল। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে চলতে লাগলেন। বাসুকিকে চেপে ধরেছেন। কত কামনা বাসনা ছোবল দিয়ে দিয়ে চলেছে। ভেসে ভেসে উঠছে কখনও বিষ কখনও অমৃত।

সেদিন কাগজে দেখলেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে সব ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করেছেন তার মধ্যে কাকলী সেনের নাম। ডঃ রজত সেনের মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। আজ ষোল বছর পর হঠাৎ এই রজত সেনের নামে উনি কেমন যেন হোঁচট খেয়ে পড়লেন। অবশ্য উনি যাকে চেনেন সে তো রুচিরা। তবে এই কাকলী কে? লিখেছে অধ্যাপক ডঃ রজত সেনের একমাত্র মেয়ে। আর অধ্যাপক ডঃ রজত সেন তো আর দ্বিতীয় নেই।

ষোল বছরের সেই ফেলে আসা অতীত তাঁকে হাতছানি দিতে লাগল। তীব্র আকর্ষণ। যে কচি কিশলয় তিনি ফেলে রেখে এসেছিলেন আজ সে কত বড় হয়েছে কত রূপান্তর ঘটেছে। বড় দেখবার ইচ্ছে হল। আর দমন করতে পারলেন না।

কদিন ধরে এই যাব কি যাব না এই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সেদিন সকালে ডঃ সেনের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। প্রায় সাতটা হবে। উত্তর কলকাতার সেই গলি সেই দোতলা বাড়ি, সামনে এক ফালি ঝুল বারান্দা। আজও সেই ডালিয়া ফুটে আছে। ভায়োলেট। ষোল বছর আগে এমনি এক সকালে যখন উনি শুধু হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলেন রাস্তায়, বেরিয়ে একবার মাত্র ফিরে তাকিয়েছিলেন। তখনও সেই ভায়োলেট ডালিয়া। স্পষ্ট মনে আছে। বাড়ির দেওয়াল এখনও সেদিনের মত ঈষৎ গোলাপী। কোন কিছু বদলায় না, হয়তো ভেতরে ভেতরে বদলায়।

কলিংবেল টিপলেন। কোন শব্দ নেই। মনে হয় লোডশেডিং। দরজায় নক্ করলেন। একবার তুবার তিনবার। খুব আস্তে আস্তে। পাছে কেউ বিরক্ত হয়। ষোল বছর পর আজ তিনি নিজের দরজায় নক করলেন বড় সন্তর্পণে বড় সঙ্কোচে। মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। হয়ত হাতটা একটু কাঁপল। ভাবলেন ফিরে যাবেন। কেন এই ঝুঁকি নিচ্ছেন! সব কিছু তো স্থিতু হয়ে গেছিল আবার কেন খুঁচিয়ে তোলা!

দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল, কাকে চাই?

—রুচিরা সেন আছে?

—রুচিরা বলে এখেনে কেউ তো থাকে না।

—ডঃ সেনের মেয়ে।

—ও, আপনি কি কাকলী সেনের কথা বলছেন?

—ঐ যে গোখেল থেকে বি. এ. পাস করেছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো কাকলী সেন। ডঃ সেনের একমাত্র মেয়ে। রুচিরা বলে তো ওনার কোন মেয়ে নেই।

বুঝে উঠতে পারলেন না কেন এই পরিবর্তন। হুঁশ হল, হ্যাঁ, আমি কাকলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—ও কি জানে আপনি আসবেন?

—না।

—আপনার নাম? কোত্থেকে আসছেন?

ভদ্রমহিলার ঔদ্ধত্যে সামান্য বিরক্ত হলেন। শরীরে কেমন যেন জ্বালা দিয়ে উঠল। উনি নিজের বাড়িতে ঢুকবেন এক অজানা মহিলার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে? হায় কপাল! নিজের বাড়ি? বললেন, আমার যে কাকলীর সঙ্গে বিশেষ দরকার ভাই। দেখছেন না সব কাজ ফেলে এই সাত সকালে এসেছি। দরজাটা আরো একটু ফাঁক করে ঢুকে পড়লেন। সামনেই সেই তু ভাঁজ সিঁড়ি। তিনি তখন চারটে ধাপ উঠে গেছেন। ভদ্রমহিলা শশব্যস্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়ান। আপনি এভাবে যাবেন না। নিষেধ আছে। ডঃ সেন ভয়ানক বিরক্ত হবেন। আমাকে বাধ্য করবেন না। আপনি বরং বসার ঘরে বসুন। প্লিজ। আমি খবর দিচ্ছি। কাকলী এখন ওর বাবার কাছে পড়ছে। তাছাড়া আপনি ঘরও চিনতে পারবেন না।

—কোন দরকার নেই। আমি ঠিকই চিনতে পারব ভাই। আপনি উতলা হবেন না।

—আপনি কাকলীর কে?

—আমি? আমি? না না কেউ না।

—তবে?

—ভালবাসি।

—আপনাকে তো কোনদিন দেখিনি।

—সুযোগ হয়নি।

উনি উঠতে লাগলেন এক ধাপ তু ধাপ করে। পা তুটো কাঁপছে। একদিন কালিম্পংএ হঠাৎ গাড়ি বিকল হওয়ায় পায়ে হেঁটে হিলটপ হোটেলে উঠছিলেন। তখন সায়াহ্নের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পা তুটো থরথর করে কাঁপছে। হয়তো পড়ে যাবেন। দীপংকর কোমরটা ধরে ফেলেছিল। মাথাটা ওর কাঁধে ঠেস্ দিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে ছিলেন। সেদিন পনেরটা মিনিট কেটে গেছিল যেন পনেরটা দিন। আজ উনি একা উঠছেন। কোথায় দীপংকর? নাইজেরিয়ায় পড়ে আছে কতদিন। কোন খবর নেই।

ল্যানডিংএ দাঁড়িয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা আগে আগে, ডানদিকে বসার ঘরে আসুন।

কেমন যেন সুরধ্বনি ভেসে আসছে বাঁ দিকের পড়ার ঘর থেকে সকালে এই আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে। ডঃ সেনের কণ্ঠস্বর উদাত্ত কলনাদিনী মন্দাকিনী। সেই দি লাস্ট রাইড টুগেদার পড়াচ্ছেন। প্রেম-প্রত্যাখ্যাত এক বিরহীর স্বগতোক্তি। তুজনেই চলেছেন। আকাশে চাঁদ। সঙ্গীতময় অশ্বক্ষুরধ্বনি। প্রেমিকা নিশ্চুপ পাষাণপ্রতিমা। এই ক্ষণিক শেষ সান্নিধ্যকে কবি অনন্তকালের সুরমাধুরী দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চান। একটি একটি করে জীবনের অসাফল্যের কাঁটা তুলে সফলতার শীর্ষে যাওয়া যায় না কি? তাঁর প্রেমিকা কি সাড়া দেবে? কে জানে তবুও কবি সেই আশাপথ চেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন।

ডঃ সেন তাঁর মেয়েকে পড়াচ্ছেন। ষোল বছর আগেও এক নিশীথে ডঃ সেনের ঘোড়া ছুটেছিল। আজও কি সে থামেনি? হয়তো আজও সে ছুটেই চলেছে। তিনি কি আজও প্রেমিকার জবাবের আশাপথ চেয়ে চলেছেন?

আজ সোনালী সেনের মাথায় ঘোমটা। ঘোমটা তিনি

কোনদিন দেন না। আজ দিয়েছেন। হয়তো নিজেকে গোপন করতে চান। গায়ে হালকা সিল্কের চাদর। গৈরিক। আজ ওনার মনের মধ্যে অস্বাভাবিক দ্বন্দ্ব চলছে। খতিয়ে দেখছেন জীবনের ব্যালান্সসিট। কিছুতেই মিলছে না। ভাগ্যের কি পরিহাস। তিনি নিজ গৃহে পরবাসী। এক অপরিচিতাকে জবাব দিতে হচ্ছে। পদে পদে প্রতিবন্ধকতা।

ভদ্রমহিলার পরনে সাদা খাটাউ শাড়ি। শ্যামলী তন্বী। উন্নতনাসা। ব্যক্তিত্ব আছে। সিঁথি সাদা। এ বাড়িতে সিঁদুর তো নিষিদ্ধ। তবে? বোঝা যায় না। কে? কী সম্বন্ধ?

—আপনি কাঁপছেন। এই ডানদিকের ঘরে আসুন। একটু বিশ্রাম করুন।

ভদ্রমহিলার গলায় সহযোগিতার স্বর।

—না না ও কিছু না। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেছিল। ঠিক হয়ে যাবে। ভাববেন না। আপনি বরং কাকলীকে ডাকুন। ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যাব।

—চলে যাবেন কেন? দরকার মিটুক। তখন না হয় যাবেন।

—যদি না মেটে?

—বেশ তো থাকুন না। কে বারণ করছে?

ওপরে সেই তিনখানি ঘর। সোনালী সেন ডানদিকের বসার ঘরে ঢুকে গেলেন। চারদিকের দেওয়ালে কাচের আলমারিতে ঠাসা ঠাসা বই। দেওয়ালের একদিকে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। একদিন নীলাচলে জগন্নাথের মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে স্খলিতবসন মুণ্ডিতমস্তক ঢুলুঢুলু আঁখি নিমাই সন্ন্যাসী। একদিকে অভয়দাতা ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ওপাশে সেই পিয়ানোটা রয়েছে। দুজনে একদিন পার্ক স্ট্রীট থেকে কিনে এনেছিলেন। সেই শোফা সেই ডিভান। জানলা দরজায় সেই পর্দা। সব লালের চেক। ডঃ সেনের লালদুর্গ। পিয়ানোর সামনে দেওয়ালে বিস্তৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত। সবই তাঁর সংগ্রহ নিজের হাতে সাজানো। সবই যেন তেমনি আছে। একটুকু বদলায়নি নড়েচড়েও বসেনি। উনি গান শিখেছিলেন বেশ ভালভাবেই। কলেজ থেকে ফিরে সন্ধ্যার ছায়া ছায়া পরিবেশে ডঃ সেন ওনার গান শুনতেন। উপভোগ করতেন উৎসাহ দিতেন সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতেন। চলে আসার দুদিন আগে আচম্বিতে গেয়েছিলেন,

'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে ॥'

—নো নো স্টপ ইট।

—কেন?

—আমি বিসর্জনের ঢাক শুনতে চাই না।

সোনালী সেনের চোখ চিক্ চিক্ করে উঠেছিল। উনি কেন যে এই গান গাইলেন বুঝে উঠতে পারলেন না। দীপংকর দাশগুপ্তকে নিয়ে তাঁর মনের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এ কি তার অজ্ঞাত স্ফুরণ? সেদিনের সেই গানের কলি আজ আবার মনে পড়ল। সবই মনে পড়ছে একটু একটু করে। মাঝে মাঝে ঝাড়ামোছা করে নিতে হচ্ছে ঐ যা। এখনও ঐ পিয়ানোর ওপর তাঁর ফটোটা বসানো আছে। তবে ফুলের মালা পরানো।

—ওটা কি মিসেস্ সেনের ছবি?

—হ্যাঁ। আজ প্রায় ষোল বছর হল মারা গেছেন।

উনি শিউরে উঠলেন। মুখ দিয়ে আর কোন কথা সরল না। তবু ভাল। ভদ্রমহিলা ওনাকে চিনতে পারেননি। না চেনার কারণও আছে অনেক। সত্যি তো সেদিনের সোনালী সেন আজ বয়সের চাপে ভেঙেচুরে মৃতপ্রায়। তাছাড়া এখন তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর কপালে কুমকুম নাকে হীরের দ্যুতি কানে ছোট্ট সবুজ দুল হাতে একগাছি করে পলকাটা চুড়ি গলায় সরু হার। সেদিনের স্বাধীন নিরাভরণা মিসেস্ সোনালী সেন আজ শৃঙ্খলিতা ক্রীতদাসী মিসেস্ সোনালী দাশগুপ্ত (ভূতপূর্ব সেন)। তবে নামের শেষে ঐ সেন পদবি এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। ফেলতে পারেননি কিংবা চাননি।

—আপনি কতদিন এখানে আছেন?

—তা প্রায় পনের বছর। আপনার পরিচয় তো দিলেন না।

—আমার পরিচয় আমি নিজেই জানি না। তবে আর দেব কি করে?

—ঠিক আছে। আপনাকে চাপ দিতে চাই না। দাঁড়ান

দেখি কাকলীর হোল কিনা।

ওনাকে আর দেখতে হল না। কাকলী বাঁদিকের পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কে মামণি?

—ইনি তোমার খোঁজে এসেছেন। ওনার পরিচয়ও দিচ্ছেন না। আর আমি ওনাকে চিনিও না।

কাকলী একটা ম্যাকসি পরে এসেছে। উনিশ বছরের সজীব প্রাণবন্ত রহস্যে ভরা কিশোরী মূর্তি। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। সেই উনিশ বছরের সোনালী সেনের নিখুঁত প্রোটো-টাইপ। সেই জলতরঙ্গের কণ্ঠস্বর, সেই হরিণচরণা নিতম্ব ভারাক্রান্তা উন্নত পয়োধরা। সোনালী সেন বিস্ময়ে বিমূঢ়। ফটোর পরলোকবাসিনী সোনালী সেন যেন ঐ ফটো থেকে বেরিয়ে এলেন জীবন্ত দেহবল্লরী নিয়ে। বলল, কে আপনি? আপনি কাকে চান?

—তোমাকে।

—আমাকে? আপনাকে তো আমি চিনি না।

—নাই বা চিনলে? কতদিন ধরে তোমাকে দেখবার জন্যে আমার মনটা ছটফট করছিল।

—কেন?

—তা তো জানি না।

—মনে হচ্ছে আপনাকে আমি কোথায় যেন দেখেছি। আপনি যেন আমার খুব চেনা আপন জন।

সোনালী সেন হাসলেন। ম্লান হাসি। কাকলী চেয়ে রইল অপলক। দুজনে যদি আর্শির সামনে পাশাপাশি দাঁড়াতেন চেহারার সৌসাদৃশ্য হয়তো ধরা পড়ত। কষ্ট-কল্প। ওনার ওপরে বয়সের আস্তরণ জমেছে এই যা। ভাবলেন রজত সেন যদিও তাঁর ফটোতে ফুলের মালা দিয়ে মনের কাছে মৃত ঘোষণা করেছেন তবুও মেয়ের মধ্যে দিয়ে ওর মাকে পেয়েছেন জীবন্ত রক্তমাংসে গড়া প্রতিমা। উনি কি দি লাস্ট রাইড টুগেদার পড়াচ্ছেন কাকলীকে? না তার মাকে?

উনি পড়াচ্ছেন ভূমিকা। দীর্ঘদিন এক মহিলা অসুস্থ শয্যাশায়ী চলৎশক্তিহীন। হঠাৎ এক প্রাণবন্ত যুবক এসে তাঁকে সম্মোহিত করল। ডাকল, ওঠ ওঠ। চল হাত ধরাধরি করে যাই। প্রেমের আকর্ষণ ভালবাসার আকর্ষণ। ভালবাসার আগুনের স্পর্শে সেই নারী উঠে পড়লেন।

যুগল মূর্তি চলেছে ম্লান চাঁদের আলোর সমুদ্র ভেদ করে অশ্বক্ষুরধ্বনির তালে তালে। কোন কথা নেই। তবে অনেক অকথিত কথা গুমরে গুমরে উঠছে এই বিদায় বেলায়।

প্রত্যাখ্যানের সেই মর্মন্তুদ যন্ত্রণা নিয়ে হয়তো আজও রজত সেন চলেছেন আঁকাবাঁকা পথে আত্মমগ্ন রুদ্ধবাক। আজ তিনি সোনালী সেনকে মৃত্যু ও অপসরণের মালা দিয়ে ভুলতে চাইছেন মুছে ফেলতে চাইছেন। পারছেন কি?

এই দি লাস্ট রাইড টুগেদারের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে একদিন দুটি প্রাণ চুপিসাড়ে নিবিড় সান্নিধ্যের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তখন ডঃ রজত সেন সবে অক্সফোর্ড থেকে পি. এইচ. ডি. করে এসেছেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল টি. এস. ইলিয়ট। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের কবি। উত্তর কলকাতার একটা নামী কলেজে উনি ইংরাজির অধ্যাপক। বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশ। কালো দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। ভরাট গলায় কথা বলেন। মাদকতা আছে। শব্দবিন্যাসে যাদুকরী শক্তি। সোনালী সেন তখন সোনালী মিত্র। ওনার ঐ দি লাস্ট রাইড টুগেদার কবিতার ভূমিকা আবৃত্তি ব্যাখ্যা শুনেছিলেন নব্বুই মিনিট। ওনার তখন বয়স কতই বা হবে? হয়তো উনিশ বছর। কবিতার মধ্যে যে এমন প্রাণ আছে মাধুর্য আছে আকর্ষণী শক্তি আছে এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলেন। তন্ময় হয়ে শুনতেন ওনার পড়া। বাড়ি গিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। কোনদিন ওনার ক্লাস ফাঁকি দিতেন না। শেষের দিকে ডঃ সেন একস্ট্রা ক্লাস নিতেন। অ্যাজ ইউ লাইক ইট, হ্যামলেট। গভীরে চলে যেতেন। এক বর্ষার মধ্যাহ্নে রাস্তায় জল জমেছে। কেউ আসেনি। কিন্তু ওনারা দুজনে ঠিকই গিয়েছেন। ডঃ সেন হেসেছেন, আরে কি আশ্চর্য! তুমি এলে কি করে?

—আর আপনি?

—আমি তো আশায় আশায়। জামাকাপড় তো ভিজে গেছে প্রায়। এমন বাদলঘন বরিষায় কী আর পড়বে। এস দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখী।

ঘর কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। হাতটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, আমার পাশে বেঞ্চিটায় বস।

সোনালী মিত্রের হাতটা ধরে ফেলেছিলেন, ও গড্ এত ঠাণ্ডা কেন?

সেই বয়সেই সোনালী মিত্র কি যেন এক ইঙ্গিতের গন্ধ পেয়েছিলেন। বাধা দিতে পারেননি। এত বড় একটা মানুষ তাঁর চেয়ে কত বড় সব দিক দিয়ে। ভয়ে আতঙ্কে ছোট হয়ে গেছিলেন।

—ভয় কি! পাণিগ্রহণে আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় তো? তোমার বাবার কাছে যাবো।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। কোন জবাব দিতে পারেননি। কী যে জবাব দেবেন তা বুঝে উঠতেও পারেননি। এত বড় একটা প্রতিভা এত বড় একটা ব্যক্তিত্ব তাঁর মত এক সামান্য নারীর কাছে যে এমনি করে হাত পাতবেন বিশ্বাস করতে পারেননি। এ স্বপ্ন না মায়া? উনি তাঁর মধ্যে কী দেখলেন? ভালবাসা হয়তো এমনি। তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করা যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না। ধীরে ধীরে ভালবাসার ফাঁদে জড়িয়ে গেলেন। মিলিত হবার টুকরো টুকরো সময় করে নিতেন। কোন দিন চলে গেলেন আলিপুর চিড়িয়াখানায়। হাজার হাজার পাখি এসেছে হিমালয় অতিক্রম করে হিমশীতল সাইবেরিয়ার রুক্ষতা ছেড়ে এতটুকু উষ্ণতার প্রত্যাশায়। এরা কি করে যে আসে কে জানে। এ যুগযুগান্তরের আসা-যাওয়া। কোনদিন সায়াহ্নে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছেন। ওপারে সূর্যাস্তের ছায়া। হয়তো নৌকাবিহার করেছেন কোন কোনদিন। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে বসেছেন দু দণ্ড। ডঃ সেন নাস্তিক ছিলেন। মন্দির চত্বরে প্রবেশ করেননি। পঞ্চবটী ওনাকে টানত। আত্মমগ্ন হওয়া যায়। ছাত্রজীবনেও উনি মাঝে মাঝে যেতেন। নিউ এম্পায়ারে গেছেন। হেলেন অব ট্রয়। কার্জন পার্কে বসে ঝালমুড়ি খেয়েছেন। মাঝে মাঝে চলে যেতেন মিউজিয়াম। কণিষ্কের কবন্ধ গান্ধার শিল্পসম্ভার সাঁচি স্তূপের নিদর্শন মাটির চাপে কি ভাবে সজীব বৃহস্পতি প্রাণহীন পাষাণে পরিণত হয়েছে। প্রাক্ বিবাহ পর্বে এমনি করেই হয়েছে তাঁদের সপ্তপদী।

বাবা প্রথমে মত দেননি। মা-মরা মেয়ে। নিজে হাতে একটু একটু করে গড়ে তুলেছেন। ভাল ব্যবসা করতেন। বললেন, জানাশোনা নয়। ঐ তো চালচুলো। এক দাদা মিরাটে থাকে। বিধবা মা সেখানে। এখানে মেসের জীবন। তুই ঐশ্বর্যে মানুষ হয়েছিস, আরামে থেকেছিস। তার ওপর পার্টিফার্টি করে। অনেক কিছু বিশ্বাস করে না। বলছে টোপর পরবে না মাথায় সিঁদুর পরতে দেবে না নোয়া পরতে দেবে না। পাগল পাগল! তুই ঘাড় থেকে নামা। তোর জন্যে অনেক ভাল ছেলে পাওয়া যাবে।

উনি কিন্তু ঘাড় থেকে নামাতে পারেননি। প্রজাপতি আঁকা ছাপায় সোনালী মিত্র একদিন মিসেস্ সোনালী সেন হয়ে গেলেন। একটি মাত্র মন্ত্র পড়া হয়েছিল, যদস্তু হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।

হায়, আজ সেই দুটি হৃদয় কত যোজন দূরে পরাবৃত্ত পথে ধাবিত হচ্ছে।

বাবা বিয়েতে ছিলেন। তবে উদাসীন ভাবে। বাছাই বাছাই কজনকে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছিলেন। কেউ কেউ মজা দেখতে এসেছিল।

—ও মা বড় পিসি যে! কি সৌভাগ্য তুমি ঐ বেতো শরীর নিয়ে এতটা পথ এসেছ। কি যে আনন্দ হল!

—না এসে কি থাকতে পারি মা? শুনলুম তোদের নাকি কি সব আদিখ্যেতের বিয়ে। তাই মরতে মরতে এলুম।

—খুব ভাল করেছ। যাও ওপরে জায়গা আছে ডান হাতের কাজটা সেরে এস। অতটা পথ আবার ফিরতে হবে তো।

—দাঁড়া দাঁড়া। আগে জামাই দেখি। আশীর্বাদ করি। বাবা কোথা রে? দেখতে পাচ্ছি না। বেচারাকে সব একা একা করতে হচ্ছে। জ্যাঠা জ্যাঠাইমা এসেছিল?

—হ্যাঁ।

—শুনলুম আসবে না বলে বেঁকে বসেছে। তা আশীর্বাদ করেছে তো?

—মনে হয়।

—যাক বাঁচা গেল। আর মা আশীর্বাদ! আশীর্বাদের আর কি দরকার আছে। ওটাকেও কাটছাঁট করে দে না।

সেদিনের সেই টুকরো টুকরো স্মৃতি দীর্ঘদিন পর আবার ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে লাগল। সেদিন সত্যি কেউ কি মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদ করেছিল? ফেলে আসা দিনের পুঞ্জ পুঞ্জ হারানো ঘটনা তার বাণীতে তার সুরে তার ঔজ্জ্বল্যে ফুটে ফুটে উঠতে লাগল।

রজত সেন কিন্তু পড়া বন্ধ করেননি। নিজে পড়িয়েছেন, বকাবকি করেছেন। কখনও ছাত্রী কখনও প্রেমিকা। একটা একটা করে পরীক্ষার গণ্ডি পার করিয়েছেন। ইংরাজিতে দর্শনে এম. এ.। ডক্টরেটের জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। সাড়া পাননি। উনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ। শিক্ষাব্রতী। শিক্ষাকে উপজীব্য করে জীবন নদী বহে যেতে চেয়েছিলেন। মিসেস্ সেন মাঝে মাঝে ওনাকে কেমন যেন ঠিকমত বুঝে উঠতে পারতেন না। মানুষটা কেমন যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। শুধু পড়া পড়া আর পড়া। নিজস্ব লাইব্রেরি। বইতে ঠাসা। কিছু হোক না হোক বই কিনে স্তূপাকার করেছেন। নাওয়া খাওয়া ভুলে কালো কালো শব্দগুলোর ওপর বিচরণ করেন। দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েন। সোনালী সেন তিন বছরের মধ্যেই কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠলেন। ডঃ সেন কলেজ ছাত্রছাত্রী আর বই নিয়ে আত্মমগ্ন আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক আসত। সেমিনার ছাত্র-ছাত্রীদের মৌখিক পরীক্ষা। আর মিসেস্ সেন পড়ে থাকতেন চার দেওয়ালের মাঝখানে সংসারের যাঁতাকলে। প্রাণহীন নিরস। সব থেকেও নিঃসঙ্গ।

—এর চেয়ে তুমি যদি বইএর সঙ্গে বিয়ে করতে?

—কেন কেন?

—আমি আর পারি না। আমিও তো রক্তমাংসের প্রাণী। বোঝ না কেন?

—ওহো! তাই বল।

হো হো করে হেসেছেন, ঠিক আছে। আর চার মাস আছে। এই টার্মটা কেটে যাবে। তোমাকে কাশ্মীর নিয়ে যাব। ডালহ্রদের ওপর হাউসবোট। কারুর পালাবার উপায় থাকবে না। কেবল তুমি আর আমি। নূরজাহান আর জাহাঙ্গীর।

—দেখ তোমায় আফিং খাইয়ে রেখে দেব।

—তথাস্তু।

—জানি না। তোমার তো কথা। সেবার নৈনিতালের প্রোগ্রাম করলে, বাতিল হল। আবার গোয়া যাবার প্রোগ্রাম হল তাও বাতিল হল। সব সময় তোমার কাছে বড় বড় কর্তব্যের ডাক আসে। আমাকে ফেলে যাও। তার চেয়ে আমাকেই এবার বাতিল করে দাও না কেন।

—তুমি যে আমার অর্ধাঙ্গিনী। অঙ্গ কি অত সহজে ছেদ করা যায়?

এই অর্ধাঙ্গিনী পড়ে থাকেন সোনার খাঁচায়। রান্নাবান্না ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা শোয়া বসা জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের ছবি দেখা। রুটিন রুটিন রুটিন। বাপের বাড়ি যাবেন তাও ইচ্ছে করে না। সব ইচ্ছে কেমন যেন মরে মরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একা একা সিনেমা যান। তাও ভাল লাগে না। অন্তর্মুখী এক অসুখী নারী। এ জীবন কি উনি চেয়েছিলেন? উনি জন্মেছেন অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে উচ্ছ্বাস আবেগ নিয়ে অপ্রতিহত গতিশক্তি নিয়ে।

—তোমার সে আবেগ কোথায় গেল? বিয়ের আগের সে উন্মাদনা? এখন তুমি হয়তো তোমার শকুন্তলাকেও বিস্মৃত হবে। তুমি দিন দিন কেমন যেন মেশিন হয়ে যাচ্ছ। সাত পিরিয়ডের রুটিন। ঘণ্টা বাজলে শুরু আবার ঘণ্টা বাজলে শেষ। নিজে থেকে কোন তাগিদ নেই।

—জান তো একদিন পাগল শিব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করার নেশায় মেতেছিলেন। ভগবতী তাঁর অঙ্গ-স্পর্শে শিবকে নিস্তেজ করে দিয়েছিলেন। হে মোর ভগবতী আজ আমিও তোমার অঙ্গস্পর্শে নিস্তেজ। সেদিনের উচ্ছ্বাস আজ স্তিমিত।

—রঙ্গ ছাড়। আমি কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি।

মনের যখন এই অকাল স্থবিরতা, বদ্ধ অবস্থা কোথা থেকে রাহুর মত দীপংকর দাশগুপ্তের আবির্ভাব। ওর বাবা ছিলেন দেরাদুনে এক উচ্চপদস্থ ফরেস্ট অফিসার। উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের কোলে কাজের খাতিরে তাঁকে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। দীপংকরের জন্ম ঐ পাহাড়ী পরিবেশে। বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষাদীক্ষা ঐ পরিবেশে। তারপর চলে যায় আই আই টিতে। র‍্যাঙ্ক পাওয়া ছেলে। প্রায় ছ ফুট দু ইঞ্চি ঋজু, দেরাদুনের ইউক্যালিপটাস গাছ। মসৃণ উজ্জ্বল রং। ঈগলের মত নাক। ঝর্ণাধারার মত কণ্ঠস্বর। বয়স কত আর হবে? হয়ত ছাব্বিশ-সাতাশ। একটা ইন্টারভিউ-এর ব্যাপারে রজতদার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কৃতকার্য হয়ে চাকরি পেয়েছে কিন্তু যেতে পারেনি। একটা একটা করে সাত মাস কেটে গেছে। সে সময় রজত সেনকে কয়েক

বার বেশ কিছুদিন বিদেশে যেতে হয়েছিল একটা ইণ্টার-ন্যাশানাল কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করার জন্যে। সেখান থেকে ফেরার পথে প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি। আমেরিকা এবং কানাডা দুদেশই চক্কর দিতে হয়েছিল। কবিতা-পাঠ সাহিত্য-আলোচনা। দেশের গতিপ্রবাহে সাহিত্য ঠিকমত প্রাণশক্তি যোগান দিতে পারছে কিনা দেশের জাতির সঠিক স্বরূপটি রূপায়িত করতে পারছে কিনা ইত্যাকার বিষয় দীর্ঘ আলোচনা করতে হয়েছে। ব্যস্ততার মধ্যে সময় কেটে গেছে। বাড়ির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ করতে পারেননি।

মিসেস্ সেনের এই নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকাতর দিনগুলিতে চঞ্চল প্রাণবন্ত দীপংকর দাশগুপ্ত তার সান্নিধ্য দিয়ে মধুর করে তুলেছিল। দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রে দুটি জাহাজ কিভাবে যেন কাছে নাগালের মধ্যে এসে গেল। এক প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা থেকে আর এক নিবন্ত প্রদীপের শিখা জ্বলে উঠল। কী যেন হারাতে বসে কী যেন হাতের কাছে পেলেন। সান্নিধ্য থেকে সৌহার্দ্য, সৌহার্দ্য থেকে ভাললাগার একটা আবেশ। ধীরে ধীরে কেমন যেন আপ্লুত হয়ে গেলেন। কথার জাল বুনে এগিয়ে যেতে লাগল দুটি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকাতর হৃদয়। নোঙরছেঁড়া উদ্দেশ্যহীন ভেসে যাওয়া। ধর্মাধর্ম ন্যায় নীতি সৎ অসৎ আনন্দ আবেগ মনের বিকার পৌরাণিক উপাখ্যান মাঝে মাঝে আদি রস সব বিষয়ই কথার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে লাগল। হাসি কলতান স্বরে গানে নিভৃত সন্ধ্যা রমণীয় হয়ে উঠতে লাগল। মনের অন্তস্তলে যে সুপ্ত নাগিনী নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল তারা যেন কেমন নড়াচড়া শুরু করতে আরম্ভ করল তাঁদের অগোচরে তিল তিল করে।

শীতের নিষ্পত্র বৃক্ষশাখা আবার যেন বসন্তের সবুজ কিশলয়ের উদ্‌গমের দ্যোতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু বছরের মেয়েকে যত্নে স্নেহে ভালবাসায় ভরিয়ে দিলেন। কোমরে কাপড় জড়িয়ে বাড়িঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। কোথাও আর এতটুকু ধুলো জমতে দেবেন না। পিয়ানোর ওপর তাঁর এবং ডঃ সেনের ছবি পাশাপাশি রাখলেন। প্রতিদিন আঁচল দিয়ে মুছে দেন। তাঁর ফেরার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকেন। মানুষটাকে বড় কাছে পেতে চান দু বাহুর আবেষ্টনের মধ্যে। মনটা কেমন যেন থচ্ থচ্ করতে থাকে। কী যে হারাচ্ছেন বা হারাতে চলেছেন তার আশঙ্কায় শিউরে শিউরে ওঠেন।

মেয়েকে চান করানো খাওয়ানো তার সম্প্রতি স্ফুটিত অধরে বাণী দিতে স্বর দিতে উঠে পড়ে লাগেন। এমনি করে সময়ের ঘোড়াটাকে সংযত করতে চাইলেন। পারছেন না। সে কেবলই তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় অজানা অন্ধকারের গহিনে।

অনেক দিন পর আবার সন্ধ্যায় সুরধ্বনি ভেসে উঠল, 'মনে রবে কিনা রবে আমারে সে আমার মনে নাই। ক্ষণে ক্ষণে আমি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই।'

কোনদিন বা গাইলেন, 'তুমি কোন কাননের ফুল, তুমি কোন গগনের তারা। তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন স্বপনের পারা।'

দুজনে তাকিয়ে থাকতেন। বাক্যহারা।

—চল রাত হচ্ছে। খাবে চল।

—কি বিপদ দেখুন তো বৌঠান। আমিও এলুম আর দাদাও চলে গেলেন। চিঠিপত্তর ঠিকমত আসছে না। কবে ফিরবেন তার কোন ঠিক নেই। আমার বিশ্রী লাগে।

—কেন?

—একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ।

মিসেস্ সেন হাসলেন, কি বীর পুরুষ গো তুমি। তোমার দাদা তোমাকে আমার দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছেন না? আর তুমি পালাতে চাইছ? বলিহারি!

—না না বৌঠান হাসবেন না। আমাকে আদর দিয়ে দিয়ে আস্কারা দিয়ে দিয়ে বাঁদর করবেন না।

—ঠিক আছে, গলায় মুক্তোর মালা পরিয়ে দেবো।

—জানেন তো সে মুক্তোর মালা ছিঁড়ে ফেলেছিল?

—কিন্তু বুকের মধ্যে তো ছবি এঁকে রেখেছিল। সেটা মনে নেই?

—বৌঠান জীবনের বেশির ভাগটাই তো হোস্টেলে হোস্টেলে কাটল। মার সঙ্গ কতটুকুই আর পাচ্ছি! স্নেহ-ভালবাসার ক্ষুধা তো মিটল না। আমি যে ভালবাসার বড় কাঙাল।

—কে নয়? সারা পৃথিবী তো যুগ যুগ ধরে ভালবাসার এতটুকু উষ্ণ স্পর্শের জন্যে আকুলিবিকুলি করে ভাই। মানুষ একা বাঁচতে পারে না। একাকীত্ব দূর করবার জন্যেই তো

তার বুকের হাড় দিয়ে ইভের জন্ম।

—ভালবাসা আর প্রেম কি এক জিনিস বৌঠান?

—কোনদিন অত তলিয়ে দেখিনি ভাই। ভালবাসা মনে হয় পূর্বরাগ। প্রেম আরো গভীরে প্রসারিত। প্রেম তো প্যাশানের অপর নাম। মনে পড়ে কুমারী জননীর নিষ্পাপ সন্তানের প্যাশানের যন্ত্রণা। প্যাশানের ক্রুশ বহে নিয়ে চলেছেন যন্ত্রণায় নুয়ে পড়ে।

—প্যাশানের অবসানেই মৃত্যু।

—খেলা শেষ।

—বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

—ওঠ ওঠ। দুষ্টু কোথাকার। পাম্প করে আমার মন খালি করে দিচ্ছ। নাও আর কোন কথা নয়। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

একটু একটু করে সমস্ত মনে পড়ছে। মনের ভিডিও চলছে। কেমন করে ষোলটা বছর পার হয়ে গেছে। নিশ্চিত সুখের গণ্ডি ভেঙে উনি একটুকু উষ্ণতার আশায় অলীক সোনার হরিণের পেছনে ছুটেছেন। কি হল? কী পেলেন? দীপংকর নাইজেরিয়ায় পড়ে আছে। কত দিন? না হিসেব আর রাখব না। কি দরকার? আমি কার? কে তোমার?

দীর্ঘ পাঁচ মাস পর ডঃ সেন ফিরে এসেছেন। এবারের বিদেশ যাত্রা তাঁর নানা দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। আবার একটা ডক্টরেটের শিরোপা পয়েছেন। তাছাড়া নানা মানপত্র হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথেয়তা ভোলা না যাওয়া ভালবাসা সম্মান। এ সাকসেসফুল ম্যান।

সোনালী সেন তাঁর হারানিধি ফিরে পেয়েছেন। আবার তাঁর বক্ষলগ্ন হয়েছেন ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেষণ করেছেন। তবে কোথা যেন আর সে সুর নেই। একটা ক্ষত বার বার খচ্ খচ্ করেছে পিয়ানো বেজেছে আবার সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে, শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।

সেদিন শ্রোতা ছিল এক। একশ্চন্দ্র। আর আজ দুটি উৎসুক চোখ। একজন পরিতৃপ্ত আপনভোলা আর একজন বুভুক্ষু পরাশ্রিত। সেদিনের সে হাসি, কথায় প্রাণের স্পন্দন, নির্দ্বিধায় প্রকাশের ব্যাকুলতা আর নেই। অফিস যায় খায়দায় শুয়ে পড়ে। মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। মিসেস্ সেনের সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন উনি রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুতে যান। ওনার মন বলে হয়তো অবুঝ বেচারা দরজায় মাথা কুটে কুটে মরে অব্যক্ত বেদনায়।

প্রথম দিন উনি একটু দেরিতে উঠেছেন। অসংবৃত। শিথিল কবরী। মুছে যাওয়া কুঙ্কুমটিপ। চোখের কোলে কালো দাগ। ঘুমের রেশ তখনও যায়নি। স্খলিত চরণধ্বনি।

দীপংকর অনেক আগে উঠেছে। নিজের হাতে চা করেছে। খেয়েছে। দরজার দিকে চেয়ে বসে আছে। হয়তো প্রতীক্ষায়। চোখে চোখ পড়েছে। কোন কথা বলেনি কোন শব্দও করেনি কোন প্রতিক্রিয়া বা বিক্রিয়া নেই। কী যেন শুষে শুষে খাচ্ছে। লজ্জায় ঘৃণায় উনি দুমড়ে দুমড়ে গেছেন। ছুটে বাথরুমে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করেছেন। আর্শিতে নিজেকে দেখে শিউরে উঠেছেন। কত কতদিন পর। কিসের লজ্জা? কিসের ঘৃণা? এ তো মন্ত্রপূত জীবনধর্ম। তবে? মনকে সায় দিতে পারছেন না। কেবল খচ্ খচ্ করছে। দীর্ঘ সাত মাস ধরে এক উষর জমিতে উনি কত আশা ভরসা বাসনা কামনার অঙ্কুর বপন করেছেন নিজের অজ্ঞাতসারে উভয়ের অজ্ঞাত-সারে। সে আজ অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। তাকে কি অত সহজে উপড়ে ফেলা যায়?

একদিন হঠাৎ বলে ফেললেন, তোমার কোন বান্ধবী নেই দীপু?

—বান্ধবী নিয়ে আমি কী করব?

—ও মা! আমি কী জানি? বান্ধবী তো মানুষের জীবনের পরিপূরক।

—কেন আপনি তো আছেন?

—হায় কপাল। আমি তো বাসী ফুল।

—তা হোক। আমি প্রসাদী করে মাথায় পেতে রাখব।

কটাক্ষ করেছেন, এত! তার দেবতা যদি বাধা দেয়?

—আমি শামুক হয়ে নিজের খোলে ঢুকে যাব।

ডান হাতটা মাথার ওপর বুলিয়ে চুল অবিন্যস্ত করেছেন, চাতক। ডিজায়ার অব্ দি মথ ফর দি স্টার, দি নাইট ফর দি মরো।

দীপংকরের চোখে জল চিক্ চিক্ করেছে। উনি ছুটে

বেরিয়ে গেছেন, আমার চোখে কী পড়ল।

এই সেই দীপংকর। সুখে-দুঃখে নির্বিকার। নিস্পৃহ সন্ন্যাসী।

চান করতে করতে ভাবতে লাগলেন। শাওয়ার খুলে দিয়েছেন। ধারাবর্ষণ। সাবান ঘষে চলেছেন। ধুয়ে যাচ্ছে। আবার ঘষছেন। ধুয়ে যাচ্ছে। আবার ঘষছেন। এমনি করে কি দীপুকে ঘষে ফেলতে পারবেন? না, উনি তো কিছু অন্যায় করেননি। না, মিছে কথা অসদাচরণ করেননি ঠিকই তবে অন্যায় করেছেন। একটা ঘুমন্ত দৈত্যকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়েছেন। নিষ্পাপ অসহায় নির্ভরশীল অনভিজ্ঞ তরুণ। নিজের জীবনে যখন ভাঁটার টান শীতলতার প্রলেপ অতৃপ্তির বিষণ্ণতা মনের মানুষকে না পাওয়ার যন্ত্রণা? সেই দুর্দিনে দীপংকরকে উনি পেয়েছিলেন। হাঁপিয়ে ওঠা বন্ধঘরে এক ঝলক আলো।

চান করে বেরিয়ে এলেন। দীপংকর তখনও বসে আছে অনড়।

—সরি। অনেক দেরি হয়ে গেল। চা করি।

—খেয়েছি। আপনার জন্যেও এক কাপ করে রেখেছি। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অবশ্য।

—ছিঃ ছিঃ! তুমি এসব করতে গেলে কেন? দাঁড়াও ব্রেকফাস্ট করি। দাদা উঠেছেন?

—হ্যাঁ। উনি ওদিকে বাথরুমে গেছেন।

—তোমরা দুজনেই বসে যাও। আচ্ছা সকাল থেকে কী এমন দেখছ বল তো? আমার লজ্জা করে না?

—আপনাকে দেখছি। চোখ তৃপ্ত হচ্ছে না।

—আমাকে তো পাঁচ-সাত মাস ধরে দেখছ।

—আজ নতুন করে দেখছি।

—দেখ, দেখে যদি আনন্দ পাও দেখ।

—বৌঠান, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই?

—ছিঃ ছিঃ, এ সব কী অলুক্ষণে কথা বলছ?

—দেখবেন বৌঠান আমায় মরতেই হবে। আমার বেঁচে কোন লাভ নেই।

বিলোল কটাক্ষ করেছেন, মরতে দিলে তো।

—সত্যি বলছেন, আমায় মরতে দেবেন না?

—সত্যি সত্যি সত্যি। এবার তুমি প্রেমে পড়েছ।

—মনে হয়। কারণ আপনি তো বলেছেন প্রেম যন্ত্রণা। আমি এখন যন্ত্রণাই পাচ্ছি।

আজ ষোল বছর পর মিসেস্ সেন ভাবতে লাগলেন। তিনিও তো প্রেমে পড়েছিলেন। সেই তো যন্ত্রণার শুরু। আজো তার শেষ নেই।

মনের একটা দিক বলেছে, দীপু কবে যাবে? আর একটা দিক ফোঁস করে উঠেছে, থাক না বেচারা। তোমার খেলার সাথী তোমার মনের সাথী, তোমার প্রাণের সাথী। একদিকে জ্ঞানবৃদ্ধ জ্ঞানতাপস অচঞ্চল হিমালয়, আর একদিকে দিগন্ত-প্রসারী চঞ্চল উর্মিমুখর সিন্ধু। হয়তো বিষাদসিন্ধু। দুটি বিপরীতধর্মী চুম্বক তাঁকে দুদিক থেকে টেনে চলেছে। ছোট্ট হৃদয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

মাস দুয়েক পর ওনারা শুয়ে আছেন। একশ আশি ডিক্রি। আজকাল এমনি হয়েছে। শুতে হয় শুয়ে আছেন। রেস্টোরেশন অব কনজুগাল লাইফ? না পজেশিভনেস? হাতটা গায়ে দিতে বললে দেন। মনে হয় রবারের হাত। প্রাণ নেই উষ্ণতা নেই। একদিন এতটুকু ছোঁয়া পাবার জন্যে কত কাতর হতেন। কিছু না, শুধু ছুঁয়ে থাকা। সে কি আকুলতা উনি কি আঁচ করেছেন? প্রেম অন্ধ নিষিদ্ধ প্রেম অন্ধ আর বধির। আবার তার স্বাদই আলাদা কষায় তিক্ত মধুর। উনি দুম করে জিজ্ঞেস করলেন, কবে যাবে?

—কে?

—দীপু।

—আমি কি জানি? তোমার আত্মীয়।

—আমার সঙ্গে আত্মার যোগ তো আর নেই!

উঠে বসেছেন। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে, মানে? তুমি কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বল।

—আমি কিছুই বলতে চাই না। দেওয়ালের ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনতে পাও না?

—ওসব বাইরের শব্দ আমি কেয়ার করি না। তোমার কথাই বল। তোমার কথাই শুনতে চাই।

—এত রাতে আর নাটক ভাল লাগে না। আমি ভদ্রলোক।

—আর আমি?

—জানি না।

—তাহলে আর আমাকে তোমার সহ্য হয় না ?

—সেকথা আমি বলিনি।

—তুমি সেপারেশন চাও ?

—না।

—আমি যদি চাই ?

—সে তোমার মর্জি। তবে কোর্টে গেলে কাগজে ছাপা হবে। সেটা আমি চাই না।

—তবে তুমি কি বলতে চাও গোপনেই ভাল ?

—নো কমেণ্ট।

সোনালী সেন ভাবলেন, জ্ঞানত তিনি কোন অন্যায় করেন নি। এখনও তিনি নিষ্কলুষ। মনের মধ্যে ছাপ পড়েছে। অস্বীকার করছেন না। এযুগে তো মনকে অজ্ঞাত রাখা যায় না। দুজনের আকর্ষণ তো তাঁর বড় আদরের ধন। কাউকেই হারাতে চান না। যুগযুগান্তর ধরে নরনারীর এই সান্নিধ্য কামনা সৃষ্টির আদিমতম উৎস। এ তো শাশ্বত সত্য। একে অবলম্বন করেই তো বিশ্বের মন্দির কাব্য প্রতিকৃতি। কোন কম্প্রোমাইজ কি করা যায় না? আজ নো কম্প্রোমাইজ। মানুষে গড়া তথাকথিত সভ্য সমাজের ভিত্তিমূলে পজেসিভনেসের বিষবৃক্ষ তার সুদূরপ্রসারী শিকড় নিয়ে সব রস শোষণ করে চলেছে। নো কম্প্রোমাইজ। দু নৌকোয় পা রাখা চলবে না। তা ছাড়া তাঁর রুচিতে বাধে। আড়াল-টারি। মিসেস্ সেন শিউরে উঠলেন। পাপ রোধের ঘুণ-পোকাটা তাঁর বুকের মধ্যে দাঁত বসাতে লাগল। বড় যন্ত্রণা।

তিনটি প্রাণ যেন একটি ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দু। বহির্মুখী। চার দেওয়ালের আচ্ছাদনে একই ছাদের নিচে দুটি প্রাণী দিনযাপন করছে মিসেস্ সোনালী সেনকে কেন্দ্র করে। তিনজনে যখন কথা হয়, মেপে মেপে। বেফাঁস যেন কিছু হয়ে না যায়। সংযত।

দীপংকর এসেছিল বিশেষ প্রয়োজনে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখন তো ওর আর এমনি করে পড়ে থাকা সমীচীন নয়। এই সহজ কথাটা বেচারা বুঝতে পারে না কেন ? অ্যাপেনডিজ্। নির্বিকার। আবার মাঝে মাঝে ভাবেন, যদি চলে যায় উনি কী নিয়ে থাকবেন ? সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু। কিসের জোরে ও থাকবে ? কিসের জোরে উনি ওকে ধরে রাখবেন ? আর ভাবতে পারেন না।

দীপংকরও চুপ, ডঃ সেনও চুপ। ক্বচিৎ কখনও দু-এক টুকরো কথা শিষ্টাচার ভদ্রতা।

—মাসীমা কেমন আছেন রে দীপু ?

—মা তো ভালই আছেন। বাবাকে নিয়েই চিন্তা।

—কেন ?

—জানেন তো, বাবা কিছুদিন হল শেষ প্রোমোশন পেয়েছেন। আজ স্বাধীন ভারতে যারা উঁচু পোস্টে থাকে তাদের হাজারো সমস্যা। ইচ্ছেমত কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। অথচ সবকিছুর ভোঁতা দিকের আঘাত সহ্য করতে হয়। বাবা হাইপার-টেনশনে ভুগছেন। মা বলছেন, ছেড়ে দাও। আর দরকার নেই। বাবার গোঁ, ছাড়ব কেন ? বাঙালীর বদনাম হবে। লোকে বলবে, মিঃ দাশগুপ্ত কাওয়ার্ড। সংগ্রামের সম্মুখীন হতে চান না। পালাতে চাচ্ছেন। প্রেসার আর সুগারের একটু আধিক্য হয়েছে।

—তবে এখন তো তোর বাবার কাছে থাকা উচিত।

—মাঝে মাঝে ভাবি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে দেরাদুনে চলে যাই। কিছু একটা জুটিয়ে নিতে পারব নিশ্চয়। অবশ্য এখেনে প্রণামীটা ভালই দেয়। তাছাড়া উন্নতির সুযোগ আছে। একটা কিছু করতে হবে রজতদা। এমনিভাবে কতদিন আর আপনাদের গলগ্রহ হয়ে থাকব ?

—তুই আমাদের পর-পর ভাবছিস দীপু ? সেই ছোট্ট প্রথম তোর দিদির হাত ধরে এলি। হাফপ্যাণ্ট পরা। লাজুক-লাজুক মুখ। আজ তুই কত বড় হয়েছিস। মা তোকে কোলে বসিয়ে রসগোল্লা খাইয়ে দিতেন। ওগো তুমি অমন চুপ করে আছ কেন? নিশ্চয় যত্নআত্তি ঠিকমত হচ্ছে না।

—না না বৌদি, রজতদার কথায় আপনি কান দেবেন না। আপনার ঋণ আমি কোনদিনও এ জীবনে শোধ করতে পারব না।

—তুই কিরে হতভাগা, পরজীবনের প্রত্যাশায় আছিস ?

মিসেস্ সেনের বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছ্যাক্ করে উঠল। কে জানে কথার ছলনা কোন্ খাতে বইবে। বললেন, রাত হচ্ছে চল খেতে দিই। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

হাই তুললেন। ক্লান্তি আলস্য বিষণ্ণতা। একটা মন বলছে দীপু চলে যাক। আর একটা মন বলছে, তুমি কী নিয়ে

থাকবে? ওকে আগলে রাখ। ও একা জড়ায়নি, তুমিও তো জড়িয়ে গেছ। এ জট খোলা অত সহজ নয়।

একদিন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী চাও দীপু?

—কিছু না।

—তবে?

—আপনি আমাকে শুধু একটু ছুঁয়ে থাকুন। তোমার পরশ অমৃতসরস তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

—ব্যাস্, আর কিছু না?

—বৌঠান, যাকে আমি পুজোর বেদীতে বসাতে চাই তাকে কি কামনার কলুষে নষ্ট করতে পারি?

উনি দু হাত দিয়ে দীপংকরের মাথাটা চেপে ধরেছেন। চুলগুলো থামচে থামচে দিয়েছেন, দুষ্টু দুষ্টু দুষ্টু।

—জানেন, যখন কোন প্রতিমার মুখের দিকে তাকাই কেবল আপনার মুখটাই দেখতে পাই। আবার যখন আপনার মুখের পানে চাই তখন প্রতিমার মুখ ভেসে ভেসে ওঠে।

ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, দীপু, আমাকে এমনিভাবে দুর্বল করে দিও না।

হায়, সেই সেদিনের দীপু আজ কোথায়? এতটুকু ছোঁয়ার কাঙালি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। যে একদিন তাঁকে ছোঁবার জন্যে আকুল হয়ে উঠত, আজ তাকে ছোঁবার জন্যে মিসেস্ সেনই ছট্‌ফট্ করছেন। চোখ ভিজে ভিজে উঠছে। তোয়ালে দিয়ে মুছে নিলেন। হয়তো জল মোছা যাবে, তবে দাগ তো মোছা যাবে না।

দীপু সেদিন খাবার টেবিলে হঠাৎ বলে ফেলল, রজতদা, দক্ষিণে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি। টু রুম। অনেকদিন তোমাদের কষ্ট দিলুম।

—দূর হতভাগা! কষ্ট আর কি? এবার মাকে নিয়ে আয়।

—বাবাকে ছেড়ে মা তো আসতে পারবে না। একটা চাকর রাখব।

—তার চেয়ে একটা চব্বিশ ঘণ্টার বিনা মাইনের দাসী রাখ। তোর বৌঠানকে বল যোগাড় করে দেবে।

—আমি কি ম্যাচমেকার?

—আহা, চটছো কেন? জান কুইন ভিকটোরিয়া সে যুগের এক নামকরা ম্যাচমেকার ছিলেন।

হাসলেন প্রাণখুলে। অনেক অনেক দিন পর। মুক্তির হাসি। রাত্রে সোনালী সেনকে আদর করলেন। গাঢ় প্রাণচঞ্চল। কতদিন পর সেই হারানো সুখ-সুখ খেলা। ওনারা রাহুমুক্ত হলেন।

দীপংকর চলে গেল। যেমন আচম্বিতে এসেছিল তেমনি আচম্বিতে চলে গেল।

—বৌঠান, পায়ের ধুলো দিন।

—আবার! দুষ্টু কোথাকার।

দাদা বললেন, আসিস। মাঝে মাঝে আসিস।

এই ভাল এই ভাল। সোনালী সেন জালমুক্ত হলেন। তবুও এই মুক্তির মধ্যে কেমন যেন খালি-খালি বোধ করতে লাগলেন। কী যেন হারাচ্ছেন জানেন না।

একদিন দুদিন করে সময় কেটে যায়। তবে এই মুক্তির মধ্যে সেদিনের অকস্মাৎ পাওয়া বন্ধনের যে কি আনন্দ তাও অস্বীকার করতে পারছেন না। এই ভাল এই ভাল। দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

ডঃ সেন বেলফুলের মালা এনেছেন। গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। শীতল মসৃণ কুসুমস্পর্শে শরীর স্নিগ্ধতার সৌরভে ভরে গেছে।

—চল রবীন্দ্রসদনে চিরকুমার সভা হচ্ছে দেখতে যাব। সকাল সকাল ফিরব। টিকিট কেটে রাখব।

—আরে আজ যে আমায় একস্ট্রা ক্লাস নিতে হবে।

কটাক্ষ হেনেছেন, আবার এই বুড়ো বয়সে একস্ট্রা ক্লাস! না, কোন কথা শুনতে চাই না। আমার সঙ্গে ন বছর আগে যে একস্ট্রা ক্লাস নিয়েছিলে, আজ আবার কেবল আমার সঙ্গেই সেই ক্লাস নিতে হবে।

একদিন হঠাৎ একটা টাই এনে হাজির, দাঁড়াও নিজের হাতে গলায় পরিয়ে দেব।

—কতবার আর এ গলায় ফাঁস দেবে?

—একশবার দেব। আমার তুমি কেবল আমারই তুমি।

—তা বলে আমাকে মারবে কাটবে?

—ভয় নেই, সুধারসে ভরিয়ে দেব। দেখ আমার মারটাই তুমি দেখলে। আর কিছু দেখলে না?

—মানুষ সম্পূর্ণ ভাল বা সম্পূর্ণ মন্দ হয় না। এর কিছুটা ওর কিছুটার সমন্বয়েই তো মানুষ।

—ওগো তুমি আমায় একটু চেপে ধর।

—তোমার চোখে জল?

মুখটা একটু সরিরে নিয়েছেন, ও কিছু না। আনন্দের অশ্রু। তুমি আমাকে চেপে ধরে রাখ—ছেড় না।

—কেন ছাড়ব?

—জানি না। মাঝে মাঝে বড় ভয় হয়।

জীবননৌকা এমনিভাবে ছলাৎ ছলাৎ করে ভেসে চলল। কতদিন কে জানে?

হঠাৎ একদিন ডঃ সেন খবর দিলেন, জান দীপুর বড় অসুখ।

—তা আমি কী করব?

—একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। ডাক্তার বলেছে জীবনসংশয়। বাড়ির চাকরটা যাই আছে, হাসপাতালে যাবে না। নার্সিংহোমে যাবে না। জোর করে নার্স রাখা হয়েছে। বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। ও কী হল, পড়ে যাবে যে?

কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর শুয়ে পড়লেন। আধো জ্ঞান আধো অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। হয়তো দু মিনিট।

—সোনা, তোমার শরীর কি খারাপ?

—না। মাথাটা কেমন ঘুরে গেছিল।

চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, দীপুকে আমি দেখতে যাব।

—যাও না! যাওয়া তো উচিত। বেচারা একা একা পড়ে আছে।

গিয়ে দেখেন দীপু দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে।

—দীপু!

—কে?

দীপ পাশ ফিরে শুল। একমুখ দাড়ি। চোখ বসা। এক মাথা কালো চুলে হয়তো অনেক দিন চিরুনি পড়েনি। মুখ শুকিয়ে গেছে। যেন কত—কত দিনের অসুখ। শরীর রি রি করে উঠল, বাবুর কী হয়েছে?

—জানি না।

—তুমি কি আত্মহত্যা করতে চাইছ?

বিছানার ওপর পাশে বসে ওর ডান হাতটা দু হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে কষ্ট না দিয়ে থাকতে পার না?

—আমি তো আসতে বলিনি।

—এর চেয়ে তুমি আমায় মেরে ফেল না কেন?

—বেশ তো ঠিক ছিলাম। তোমার মূর্তি গড়ে গড়ে দিনরাত কেটে যাচ্ছিল। সহ্য করে নিচ্ছিলাম। কেন আবার এলে? ধরে রাখতে তো পারব না?

—আমার দুঃখটা তো কেউ বোঝে না। না তুমি, না সে।

ঘরদোর পরিষ্কার করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নার্সকে সব কিছু নির্দেশ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন সন্ধ্যার একটু পর। ডঃ সেন গা হাত পা ধুয়ে সকালের বাসী কাগজ পড়ছেন। বললেন, কেমন আছে?

—বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে।

—দেখ দেখি তোমার কত ধকল গেল।

—ঠিক আছে। চা খেয়েছো? আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে চান করে আসছি। একসঙ্গে খেয়ে নেব।

আজ দুজনে শুয়ে আছেন। মুখোমুখি। ডঃ সেন ডান হাতটা আর ডান পাটা ওনার গায়ের ওপর রেখেছেন। আর উনি বাঁ হাতটা ডঃ সেনের পিঠে রেখে তাঁর বুকের ওমের মধ্যে পড়ে আছেন। দুটি দেহ এত কাছে কিন্তু একজনের মন যোজন দূরে—রোগকাতর পাণ্ডুর মুখখানা ভেসে ভেসে দগ্ধে দগ্ধে মারছে।

খুব ভোরে উঠেছেন। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছেন। ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। সামান্য শীত-শীত করল। চাদরটা গায়ের ওপর চাপিয়ে দিলেন। ফার্স্ট বাস চলে গেল হাওড়া স্টেশনে। দূর বহু দূর থেকে একটা কোকিলের ডাক ভেসে ভেসে আসছে। হয়তো খাঁচায় হয়তো গাছের ডালে। দিগন্ত থেকে দিগন্তে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ধ্বনি প্রতিধ্বনি। পৃথিবীর ঘুম ভাঙছে। মিসেস সেনেরও ঘুম ভাঙছে। একটা ব্যথা একটা অভাব-বোধ তাঁর বুকটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সূর্য উঠছে। হে সর্বপাপঘ্ন দিবাকর, তোমায় প্রণাম করি।

ডঃ সেন কলেজ যাবার সময় বলে গেলেন, একবার যেয়ো। বেচারাকে দেখে এস। তবে আমি সাতটায় ফিরব। ফিরে যেন তোমায় দেখতে পাই।

মিসেস সেনের ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। হাসলেন। বড় বিষণ্ণ করুণ হাসি। কেন ডঃ সেন এমনি হাট করে আগল খুলে দিচ্ছেন? কোন অভিসন্ধি আছে কি? মানুষটা তো আপনভোলা স্বপ্নে সন্তুষ্ট। আচ্ছা উনি কি এই মানুষটাকে ঠকাচ্ছেন? মনে বচনে কায়ে জাগরণে রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সংসর্গ হয়, তবে হে পবিত্র পাবক, তুমি আমায় দগ্ধ কর। ওনার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

দিনসাতেকে দীপু অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। ট্রাঙ্ক কল করে মা বাবাকে আসতে বারণ করে দেওয়া হল। মা চিঠি দিলেন, বৌমা, তোমাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি, তবে দীপুর চিঠির মধ্যে দিয়ে তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। তুমি ছিলে তাই ও এযাত্রা এত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠেছে। তুমি যা করেছ ওর মাও হয়তো তা করতে পারত না। ওকে এবার সংসারী করতে হবে। তোমার মত একটা লক্ষ্মী মেয়ে দেখে দাও। আমি নিশ্চিন্ত হই। তোমার জীবন সুখের হোক মধুর হোক।

আজ সোনালী সেনের এই চুয়াল্লিশ বছরের জীবন কত যে সুখের হল কত যে মধুর হল তা ভগবান তিনিই জানেন। সুখের সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতেই তো সারাটা জীবন কেটে গেল। সবাই তো নিশ্চিন্ত হতে চায় কিন্তু ওনার কথা কি কেউ ভাবে সত্যিকার দরদ দিয়ে?

দিন কেটে যায়। সোনালী সেনের একটা সত্তায় রজত সেন আর একটা সত্তায় দীপংকর দাশগুপ্ত। রোজ দীপংকরকে না দেখে থাকতে পারেন না। নয়ন না তিরপিত ভেল। নেশা নেশা নেশা।

ডঃ সেন ফেরেন সাতটায়। দেখেন তাঁর স্ত্রী তাঁর সম্পত্তি রুচিরাকে নিয়ে খেলা করছেন আদর করছেন ছড়া শোনাচ্ছেন সুর করে করে। কখনও গান গাইছেন পিয়ানো বাজাচ্ছেন। হেসে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। শম্ভুর মার সঙ্গে রসিকতা করছেন। নদী বহে চলেছে তর তর করে আপন ছন্দে। স্বামীর কোট খুলে দিয়ে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রেখেছেন। চা দিয়েছেন। এক এক দিন এক এক মেনু। পাশে বসে হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। কখনও বা নিরিবিলিতে বুকের ওপর মাথা রেখেছেন। চুলে বিলি কেটেছেন। বিবাহিত জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা সঞ্জীবিত করেছেন। রাত্রে ওনার শরীরের ওমে নিজেকে চেপে ধরেছেন।

ডঃ সেন আচরণের এই আধিক্য ঠিকমত বুঝে উঠতে চেষ্টা করেছেন। এ কি আন্তরিক? না অভিনয়? না উনি মনের কোন অশুভ তাগিদের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন?

সোনালী সেন কারুর সঙ্গে মেশেন না। ধীরে ধীরে নিজেকে শামুকের মত খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলছেন। কেউ তো বোঝে না ওনার অন্তর্জাল-বদ্ধ মনের দুর্নিবার দ্বন্দ্ব। আজ উনি এক কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। এগিয়ে চলেছেন বদ্ধ দেওয়ালের যূপকাষ্ঠের দিকে। আজকের ধর্মাধর্মবোধ ন্যায়নীতিবোধ দর্শনবোধ তথাকথিত বিবেক-বোধ কি যে ব্যাখ্যা করবে কে জানে? কী যে রায় দেবে কে জানে? আজ সবাই ওনাকে সমালোচনা করবে, ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেবে, কিন্তু সত্যিকার দরদ দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করবে না।

না, উনি কোনক্রমেই অ্যাডালটরি করতে পারবেন না। এরকমভাবে চলতে পারে না। একটা রাস্তা বেছে নিতে হবে। একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। টু বি অর নট টু বি। সেদিনের সেই অসহায় অবস্থার কথা ভেবে আজ তিনি একটু হাসলেন। কত উজান ঠেলে পারে ওঠবার চেষ্টা করেছেন। পেরেছেন কি? কে জানে?

রাত্রি গভীর হচ্ছে। উঠলেন। বাথরুমে গেলেন। চোখে মুখে জল দিয়ে আবার একটা কামপোজ খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মন ভেসে ভেসে চলেছে। উনি ফিরতে পারবেন না। ফিরতেও হয়তো চান না। আস্তে আস্তে মনে পড়ছে কত কথা কত সুখ ব্যথাভরা কাতরতা। ওনার সেই লাস্ট সাপার। বেশ মনে আছে বাইশে শ্রাবণ। ডঃ সেনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া। তবে উনি চেয়েছিলেন বিদায়ক্ষণটি যেন তিক্ত না হয়। তাঁর হৃদয় নিংড়ে নিংড়ে বেদনার বিন্দুগুলি স্মৃতির ঝিনুকে ভরে রাখতে চেয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় পিয়ানো বাজল। সেদিন দুজনে দুলেছিল বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা। সেই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে ভুলো না।

গায়িকা আর শ্রোতার দুজনেরই চোখে জল।

ডঃ সেন এই দিনটির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। বিচলিত হননি।

মেয়েকে খাওয়ালেন। স্বামীকে খাওয়ালেন। অদ্ভুত একটা ডেসার্ট তৈরি করেছিলেন।

—ফ্যাণ্টাসটিক্।

—আর একটু দিই?

—দাও। আজ আর তোমার কোন আশা অপূর্ণ রাখব না।

বুকটা একটু কাঁপল। সামলে নিলেন।

শম্ভুর মা রুচিরাকে নিয়ে ওঘরে চলে যাবার আগে উনি মেয়েকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন একটা একটা করে অগুনতি। মেয়েকে বললেন, দাও আরো দাও।

নিজের শোবার ঘরে এলেন। ডঃ সেন সিলিংএর পানে তাকিয়ে রিং করছেন।

—আজ তোমায় ঘুমোতে দেব না।

—বেশ তো; জাগরণে যায় বিভাবরী। আঁখি হতে ঘুম নিল হরি মরি মরি।

সোনালী সেন রজত সেনের বুকের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিলেন। দু হাত দিয়ে গলাটা বেষ্টন করলেন। মায়াবন্ধন। ডঃ সেন বললেন, বল।

—কী বলব?

—যা তোমার ইচ্ছে।

—যদি তোমার ভাল না লাগে?

—আমার ভাল নাই বা লাগল। তোমার ভাল লাগলেই হল।

—এত স্বাধীনতা?

—জানই তো, আমি পার্টি করি। মানুষকে স্বাধীন জীব বলেই গণ্য করি। তার বাক্‌স্বাধীনতা কর্মস্বাধীনতা স্বীকার করি।

—যদি ভুল করি?

—ভুল করতে করতেই তো মানুষ একদিন সত্যের দিকে এগিয়ে যাবে। তার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে যে তাগিদ আসছে তাকে রোধ করতে নেই।

—ভাল মন্দ কে বিচার করবে?

—ও তো আপেক্ষিক শব্দ। নিজের নিজের বিবেক বিচার করবে।

—দেখ ঐ নিষ্ঠুর বিবেক আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তুমি বলে দাও আমি কী করব?

—ঐ বলে দেওয়াকেই তো মগজ ধোলাই বলে।

—না না, ওসব তত্ত্বকথা ছাড়। আমি তোমার সোনা। সোনার জন্যে অন্তত একটু ভাব।

—সোনা, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল, আমি শর্ত রেখেছিলাম, না বুঝে বামুনের মন্ত্রপাঠ করব না। বাংলায় বলব। মনের কথা বলব। সাত পাক ঘুরব না। নাপিতের গালাগাল শুনব না। হাঁটু ধরে মেয়ের বাপ যে গোদান করবে সে দান আমি গ্রহণ করব না।

—জানি গো জানি। আমি সিঁদুর পরব না আলতা পরব না হাতে নোয়া পরব না নাককান বিঁধোব না।

—নিশ্চয়। এখনও আমি তা বিশ্বাস করি। ও তো ক্রীতদাসপ্রথা। মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকে স্বাধীনভাবে জন্মেছে।

—থাক। তুমি আমাকে বল, আমি কী করব। আমি বড় ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত।

গণ্ড বয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

—সোনা, আমার বুকের স্পন্দন তুমি অনুভব করছ?

—করছি।

—আমার ব্যথা বুঝতে পারছ?

—পারছি।

—তবে?

—বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

—ভালবাসা মাকড়সার জাল নয়। তার যে সহস্র বাহু দিয়ে ঘিরে ফেলে শুষে শুষে খাবে বেরোতে দেবে না, তাও নয়। ঐ যে বলে না, ভালবাসা শাশ্বত অবিনশ্বর যুগযুগান্তর জন্মজন্মান্তর থেকে বহে চলে নরনারীযুগলকে কেন্দ্র করে। আমি এই পচনশীল ভালবাসাকে বিশ্বাস করি না। আমরা তো ভালবাসার কঙ্কাল নিয়ে খেলা করছি। যেটুকু পেলাম সেটাই সত্য। যা পেলাম না তার জন্যে অনুশোচনায় হাহাকার করতে চাই না। বরং যা পেয়েছি সেটাই রোমন্থন করা ভাল।

—তোমার এতটুকু ক্ষোভ হবে না? দুঃখ হবে না?

—কিসের ?

—হারানোর ?

—তবে তোমার রুচিরাকে আমার কাছে রেখে যাবে।

—তিন বছরের মেয়েকে তুমি মানুষ করতে পারবে ?

—আমি সব হারাতে চাই না।

—রজত, তুমি আমাকে ধরে রাখ। আমাকে ভাসতে দিও না।

—অনেক দিনই তো নোঙর থেকে বাঁধন খুলে ফেলেছ। তবে তোমার কাছে আমার একটা শেষ প্রার্থনা আছে। পাব কিনা জানি না।

—বল।

—একবার দি লাস্ট্ রাইড টুগেদার কবিতাটা পড়তে চাই। তুমি চুপটি করে শুনবে। সাড়া দাও তো ভাল। না দিলে কোন দুঃখ নেই।

বাইশে শ্রাবণ। মেঘমেদুর আকাশ। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে এক টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে। ক্ষয়া চাঁদকে মাঝে মাঝে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ঢেকে ঢেকে দিচ্ছে। রাত্রি এগিয়ে চলেছে। বিরহী অধ্যাপক অনুচ্চ স্বরে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন। সম্মোহিত শ্রোতা নিশ্চুপ নিশ্চল।

আজও মিসেস সেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন সেই স্বরলহরী সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে চলেছে পৃথিবীর আদিম বিরহী বিরহিণী। রুক্ষ মরু পর্বতে তাদের ছায়া-ছায়া যুগলমূর্তি। উনি খোলা জানলার দিকে তাকালেন। চাঁদ এদিক থেকে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। নীল আকাশ। আজ কোন মেঘ নেই। বাংলার কি মাস কে জানে। আর মাসের হিসেবও রাখেন না। কী হবে ?

অতীতের ভুত আজ ওনাকে পেয়ে বসেছে। ডঃ সেন শুয়ে পড়েছেন। অবসন্ন। মন আর শরীর। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি ? কে জানে।

খুব ভোরে শুধুমাত্র একটা এ্যাটাচি নিয়ে উনি নেমে গেলেন। আর ফিরেও তাকালেন না।

এই ভাল। এই ভাল।

তারপর ? তারপর তিনি তাঁর সুখের নিধিকে বুকে করে করে ঘুরেছেন এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। কোথাও স্থিতু হতে পারেননি। সমুদ্রগর্জনের মত কানে এসেছে সেই ফিস্‌ফিস্। হয়তো সত্য হয়তো পাপবোধ থেকে সঞ্জাত মনগড়া অনুভূতি। কিছুই ভাল লাগে না। ভাল না লাগার তাড়া খেয়ে ছুটে ছুটে চলেছেন অবিরাম। আজ রাঁচি। দু বছর পর বোকারো, আবার ভিলাই। দীপ, আর ভাল লাগে না। অন্য কোনখানে অন্য কোনখানে।

—বারো বছর তো অনেক জায়গা ঘুরলুম। আত্মীয়স্বজন সমাজ-সংসার সব ছিঁড়ে ফেলে চলে এসেছি। এ প্রেম না প্যাশান না মোহ জানি না।

—তোমার কি মা বাবার জন্যে মন-কেমন করছে ? বল, আমি বাধা দেব না। আমি তোমাকে জোর করে ধরে রাখতে চাই না। আর ইউ ফেড্ আপ ?

—ফেড্ আপ হলে তো চলবে না। বরং বর্তমানের কঠিন দিকটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তুমি যে স্থিতু হতে পারছ না। এটা অস্বীকার করা যায় না। তুমি তো আর নিজেকে বন্ধনে জড়াতে চাও না।

—প্লিজ, আমাকে চাপ দিও না। এ বয়সে আর আমার ওসব সহ্য হবে না।

—না, আমি চাপ দেব না। তবে আমারও তো একটা ইচ্ছে আছে।

—আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা কর। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল যেখানে খুশি—দূরে বহু দূরে।

—বেশ চল ভদ্রাচলম।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে গেছেন। আবার সেখানে নাভিশ্বাস উঠেছে। তাঁবু গোটাবার জন্যে ছটফট করেছেন।

তারপর ? তারপর ধীরে ধীরে তাঁর গতিশক্তি হারিয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কত গিরি-কান্তার পার হয়ে এলেন। তবু চিত্ত ভরল না। সম্প্রতি ফিরে এসেছেন তাঁর ফেলে যাওয়া সেই পুরনো শহরে। একই মাটিতে আমি সে ও সখা। এবার উনি কিন্তু মুখথুবড়ে পড়েছেন। আর দীপংকর ছুটে চলেছে শহর থেকে শহরে দেশ থেকে দেশান্তরে। আজ লিবিয়া, কাল ইরাক, ইরান, পরশু নাইজেরিয়া। সে যেন কেমন হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। সোনালী সেন একা, বড় একা, নিঃসঙ্গ।

ডঃ সেনের সিটিং রুমে বসে বসে ভাবতে লাগলেন এই ভদ্রমহিলাকে ? কিসের অধিকারে তাঁরই হাতে গড়া এই

সংসারে কর্তৃত্ব করছেন ? একচল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর বয়স হবে হয়তো। প্রায় পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা। সামান্য স্থূল শরীর। মাথার চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। সিঁথির বাঁদিকে ছোট্ট সাদা ছোপ। চোখ মুখ হয়ত কুমোর দিয়ে গড়া নয় তবে চট করে চোখ ফেরানো যায় না। চলার মধ্যে ছন্দ আছে। পেছন ফিরে চললে মোহময় আকর্ষণ অনুভূত হয়। মরালগ্রীবায় শিথিল কবরী। কাকলী ওনাকে মামণি বলে ডাকে। তবে কী ? তবে কী ? মিসেস্ সেন আর ভাবতে পারলেন না। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হল।

ঈর্ষা! হাসলেন। হায়রে পোড়াকপাল! এই বুড়ো বয়সে ঈর্ষা ? যে সংসার তিনি একদিন অবহেলায় অনাদরে ফেলে চলে এসেছেন, ফিরেও তাকাননি, কোন খোঁজও করেননি, যে সংসার একদিন তাঁর কাছে জতুগৃহ বলে মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল এখানে থাকলে হয়তো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবেন—আজ সেই ফেলে আসা অবহেলার সংসার তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সোনালী, তুমি ফিরে এস। তোমার ছবির মালা ফেলে দাও। পাষাণী অহল্যা প্রাণময়ী হোক।

—আপনি কী চান ?

কাকলীর কথায় উনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কী জবাব দেবেন ? যা চেয়েছিলেন তা কি উনি পেয়েছেন ? বললেন, চাইবার তো মানুষের অনেক কিছুই থাকে মা। চাওয়া কি যায় ? না পাওয়া যায় ? খবর পেলাম তুমি নাকি এবার বি. এ.তে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছ। তাই আশীর্বাদ করতে এলাম।

কাকলী অভিভূত হয়ে পায়ের ধুলো নিল, আপনি বসুন। আপনাকে বড় ভাল লেগেছে। আপনি কি আমার কেউ হন ?

—না, এমন কিছু না।

তাঁর গলাটা কে যেন টিপে ধরেছে।

—আপনি কী যেন চেপে যাচ্ছেন। আপনি বড় অসময়ে এসেছেন। আমি এখন ইউনিভার্সিটি যাব। আবার বাবার এখন ম্যাসাজ হবে।

—বাবার ম্যাসাজ !

মামণিই বললেন, আপনিই বা জানবেন কি করে। স্ত্রীবিয়োগের এক বছরের মধ্যেই ডঃ সেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ট্রোক হয়েছিল। ভালরকমই। শরীরের লোয়ার পোরশনটা একেবারে পড়ে গেছিল। অনেক সেবা চিকিৎসা করে কিছুটা ভাল হয়েছে। তবে বিছানা থেকে জীবনে আর উঠতে পারবেন না। বিছানায় শোওয়া বিছানায় বসা। স্ত্রীকে উনি বড় ভালবাসতেন। স্ত্রীবিয়োগব্যথা সহ্য করতে পারেননি। একে এই অসুখ, তার ওপর ঐ কচি মেয়ে। ওনার দেওয়া বিজ্ঞাপনের জবাবে আমি এসে পড়ি। আমার স্বামী সেসময় হঠাৎ বাস-চাপা পড়ে মারা যান। হাজার পনেরো টাকা পেয়েছিলাম। দিশাহারা বাস্তহারা। ডঃ সেনের সংসারে জড়িয়ে পড়ি। আজও জড়িয়ে আছি। বার হতে পারছি না। এই মানুষটাকে ছেড়ে কি করে যাই বলুন তো ? ওনার ম্যাসাজ করা, ওনাকে একটু বসিয়ে দেওয়া, চান করানো, গা মোছানো, খাওয়ানো, টাইমে টাইমে ওষুধ দেওয়া। আমার কত কাজ। ঘরের মধ্যে পড়ে থাকেন। জানলা দিয়ে টুকরো আকাশ দেখেন, পাখির ডাক শোনেন—তাও ঐ জানলা দিয়ে। আর আমি যাবই বা কোথায় ? আমিও পড়ে আছে উনিও পড়ে আছেন। ওনাকে নিয়ে একটু একটু নাড়াচাড়া করি। দিন কেটে যায়।

দূরে বহু দূরে জলপ্রপাতের শব্দ হচ্ছে। আছড়ে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। মামণির কথার জলতরঙ্গ মিসেস্ সেনের সারাটা বুক তোলপাড় করে দিচ্ছে। বেদনায় মমতায় তাঁর শরীর মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। অজ্ঞান হওয়া মানুষ জ্ঞান ফিরে পেলে কেমন যেন আচ্ছন্নতার ঘোরের মধ্যে থাকে। দূরাগত শব্দ ভেসে ভেসে আসে চৈতন্যের পরিসীমায়। যন্ত্রণাকাতর স্মৃতিভারাক্রান্ত স্থবির মানুষটা আজ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে আছেন। বড় ইচ্ছে হয় একবার দেখা করতে। সেদিনের মত ওনার চুলে বিলি কেটে দিতে। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে ঐ ইজিচেয়ারটার ওপর আধশোয়া হয়ে চোখ বন্ধ করে মাঝে মাঝে বলতেন, সোনা, আমার চুলের মধ্যে তোমার হাতটা একটু বুলিয়ে দাও না। এত আরাম পাই। এমনি করে মা একদিন আমাকে ঘুম পাড়াতেন। কখনও বা বলতেন, শুধু একটু ছুঁয়ে থাক। জান তোমার ঐ এতটুকু ছোঁয়ায় শরীরের রোমকূপে প্রাণতরঙ্গের সঞ্চার হয়।

মিসেস্ সেনের বড় ইচ্ছে করতে লাগল সেই কাঙাল

মানুষটাকে শুধু একটু ছোঁয়া দিতে। অলীক মৃত্যুর ছলনায় উনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করে চলেছেন। আজ একা একা।

কিন্তু কাকলী সেন? আজ এই দীর্ঘদিন পর সে কি এই বিপজ্জনক সত্যের সম্মুখীন হতে পারবে? স্বীকার করে নিতে পারবে তার দ্বিচারিণী জননীকে? ফুলের মালা দিয়ে যার পবিত্র স্মৃতিকে লালন করে চলেছে বোধশক্তি উন্মেষের লগ্ন থেকে? এই আঘাতে মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না নিশ্চয়।

কাকলী, তোমার মা মরে গেছে। ষোল বছর আগে যে সোনালী ছিল আজ ইনি তার প্রেতচ্ছায়া। ছবির মিসেস্ সেনের নাক কান খালি, দগদগে সিঁথি। আর এই যে সোনালী সেন কাকলীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নাকে হীরের নাকছাবি কানে মুক্তোর দুল সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর কপালে কুঙ্কুম টিপ গলায় সরু হার হাতে পলকাটা চুড়ি। দীপংকর দাশগুপ্তের বায়না। না মিটিয়ে থাকতে পারেন নি। কেবল সেনটাই আঁকড়ে ধরে আছেন।

—সরি! তোমাদের সময় নষ্ট করলাম। হয়তো বিরক্ত করলাম। আসি।

—না না কিসের বিরক্তি! আর একদিন আসুন না। বাবার সঙ্গে গল্প করবেন। উনি মানুষ বড় ভালবাসেন।

আবার হাতছানি! উনি কোন জবাব দিলেন না। কেবল হাসলেন। বেদনাবিদ্ধ ম্লান হাসি। উনি যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছিলেন সেই সিঁড়ি নামতে লাগলেন। প্রতিটি ধাপ তাঁর অঙ্গের সামিল হয়ে আছে। তিনি নামতে লাগলেন এক দুই তিন। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল। ডান হাত দিয়ে রেলিং ধরে ফেললেন।

—কে? কে? কাকলী কার সঙ্গে কথা বলছ?

শোবার ঘর থেকে অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা ভেসে ভেসে আসতে লাগল কাতর প্রার্থনার মত। কত দিনের সুপ্ত জিজ্ঞাসা। মাথাটা ঝাঁকাতে লাগলেন। শক্ত হও, সোনালী শক্ত হও। পালাও পালাও।

এক কোদাল দু কোদাল করে মাটি পড়তে লাগল। কঙ্কাল যেন কবরের মধ্যে থেকে কোনদিন মাথা তুলতে না পারে।

—বাহাদুর বাড়ি চল।

বাহাদুর গাড়িতে স্টার্ট দিল। উনি বাড়ি ফিরতে লাগলেন। বাড়ি থেকে বাড়িতে।

বিলাসিনী সোনালী সেন মায়াবিনী সোনালী সেন শুয়ে আছেন নিজের ঘরে ফোমের বিছানায়। চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। হাত দুটো ছড়ানো। শবাসনা। একা—সম্পূর্ণ একা। চোখের পাতা কিছুতেই পড়ছে না। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। বাথরুমে গেলেন। চোখে মুখে কানের পাশে ঘাড়ে জল দিলেন পায়ে জল দিলেন। আশিতে নিজেকে দেখলেন। নাইটি ঢাকা শরীর একটা বয়সের ভারে স্থির অচঞ্চল সুধারসে ভরা। তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেললেন। ফ্রিজ থেকে জলের বোতল নিলেন। আবার একটা কামপোজ খেলেন।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। অতীত হাতড়ে হাতড়ে চলেছেন। কত কথা ছিল কত সাধ ছিল। হয়তো কিছু পূরণ হয়েছে। বেশিটাই তো বাকি রয়ে গেল। যে অতীত উনি অতিক্রম করে এসেছেন হাজার মাথা কুটলেও সেখানে ফিরে যেতে পারবেন না। বাবাকে মনে পড়ছে। বাবা কি সত্যি আশীর্বাদ করেছিলেন? দীপংকর, দীপংকর, আমার দীপ, তুমি কেন অত দূরে চলে যাও? তোমার জন্যে আমি কী না ত্যাগ করেছি? স্বামী, স্বামীর ঘর, পুতুলের মত কাকলী, মানসম্মান আত্মমর্যাদা। স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকেছি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করেছি। শুধু তোমায় ভালবেসে, ভালবাসা জিনিসটা যে কী তা তোমার কাছে শিখেছি। একদিন তোমার মধ্যে যে উন্মাদভাব ছিল, যে উন্মাদনা আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল, রোধ করতে পারিনি বাধা দিতে পারিনি। ভেসে গেছি। আজ তুমি কোথায়? মনে হয় তিন মাস হল নাইজেরিয়াতে পড়ে আছ। জানি না সত্যি কোথায় আছ। চিঠি তো দাও না। ঐ যা বলে গেছ। একদিন তুমি ছিলে সদ্য পাস করা তরুণ তাপস। আজ বয়স্ক একজিকিউটিভ। দায়িত্বশীল। আর আমি? আলমারিতে তোলা প্রতিমা। না উৎসব শেষে মৃন্ময় পাত্র। চিঠি দাও না। ব্যাংকে নিয়মিত টাকা পাঠাও। টাকাটাই কি সব? হয়তো সময় পাও না। ব্যস্ত মানুষ। তোমার ক্লাব আছে ড্রিংক আছে নতুন নতুন বন্ধু আছে। বান্ধবী কি দু-একটা জোটে

নি? আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি তোমায় উপোস করতে বলি না। কেন বলব? আমি তোমার কে? আমাদের ইমারতের মশলা তো কাঁচা। তুমি দীপংকর দাশগুপ্ত আর আমি সোনালী সেন। পাঁচিল ভাঙিনি। আজ এই অবেলায় পঙ্গু রজত সেনের হারানো প্রেম হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সোনালী সেন এক পা এক পা করে একটা দীর্ঘ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছেন আলোর দিশার সন্ধানে। বড় একা।

ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছেন হারিয়ে যাচ্ছেন। অস্পষ্ট হচ্ছে ডঃ রজত সেন দীপংকর দাশগুপ্ত কাকলী সেন মামণি দু ভাঁজ সিঁড়ি পিয়ানোর ওপর ফুলের মালা পরা তাঁর ছবি ম্যাসাজের শিশি ভায়োলেট ডালিয়া বিষণ্ন বাবার মুখ। চোখ জুড়ে জুড়ে যাচ্ছে। কোন রকমেই তাকাতে পারছেন না। মাথাটা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। উনি কি এবার ঘুমিয়ে পড়ছেন? ভয় হচ্ছে এ ঘুম যদি না ভাঙে। ওঠবার চেষ্টা করছেন পারছেন না।

কেমন যেন ধীরে ধীরে স্থির হচ্ছেন। কামপোজের পাতাটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে দলা পাকাতে লাগলেন, দলা পাকাতে লাগলেন, অবিরাম দলা পাকাতে লাগলেন।

জোয়ার ভাঁটা

আবদুল জিন্নাত

যাচ্ছিলাম জোয়ারের টানে
বাসায়
দিক ভুল নৌকা আটকে গেছে
বালির চড়ায়
স্মৃতির বাক্স খুলে হাতড়াই
এ-পিঠ ও-পিঠ
যদি কোন প্রিয়তর মুখ
থাকে অপেক্ষায়

দূরের মাঠে কারা যেন বুনে চলে
রক্তের বীজ
যেখানে অন্ধকার থমকে আছে
ভোরের আশায়

যাচ্ছিলাম ভাঁটার টানে
বাসায়
মৃত্যু পরিয়ে দেয় গলায়
ভালবাসার মালা।

কাজী আবদুল ওদুদ : জন্মশতবর্ষপূর্তির ভাবনা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কাজী আবদুল ওদুদকে কবে প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে পড়ে না। হয় তাঁর পুরনো সহকর্মী কবি-অধ্যাপক পরিমলকুমার ঘোষের বাড়িতে অথবা কোনো সভায়, অথবা তারক দত্ত রোডে তাঁর নিজের বাড়িতে। তবে একথা মনে পড়ে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি এমন সহৃদয়তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন যে তাঁর সঙ্গে বয়সের বড় ব্যবধান সত্ত্বেও এক ধরনের সৌহার্দ্য জন্মায়। সেই সৌহার্দ্য তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল। এবং একটি 'সামাজিক সূত্রে' তিনি আমাকে একটু নেক-নজরে দেখতেন। তাঁর পত্নীর মতো রন্ধনপটিয়সী খুব কম দেখেছি। ওদুদ-দম্পতি খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। এবং একাধিকবার তারক দত্ত রোডের বাড়িতে খাওয়াতে তৃপ্তি পেয়েছি। কালক্রমে তাঁর জামাতা, কন্যা ও দৌহিত্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়। আফশোষের কথা, কলকাতার বাড়িতে কাজী আবদুল ওদুদের মৃত্যুর (১৯৭০) সংবাদ ঢাকায় পৌঁছতে দেরি হয় এবং তাঁর শোকার্ত কন্যা দুই রাষ্ট্রের সীমান্তের বাধা পেরিয়ে যখন কলকাতা এসে পৌঁছন তখন অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছিল। আজো সেই রোরুদ্যমানা কন্যা জেবুন্নিসার ঢাকা থেকে কলকাতায় শেষ দেখার আশায় ছুটে আসার দৃশ্যটি চোখের সামনে ভাসে।

আমি যে কাজী আবদুল ওদুদকে চিনতাম তিনি চিন্তাবিদ মনীষী। আমার জানা ছিল, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্বভারতীতে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' (১৯৩৫) আর 'বাংলার জাগরণ' (১৯৫৬)। তাছাড়া আমাদের সামনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' (১৯৫৭) ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি যে একদা ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (১৯২৬) এবং 'শিখা' পত্রিকা প্রকাশে অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ও তার ফলে ঢাকার গোঁড়া মুসলিমদের বিরাগভাজন হন, তা জানা ছিল।

কিন্তু তিনি যে গল্প উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তা জানা ছিল না। তিনি দুখানি উপন্যাস লেখেন 'নদীবক্ষে' (১৯১৯) আর 'আজাদ' (১৯৪৮), গল্পগ্রন্থ 'মীর-পরিবার' (১৯১৮)।

কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় দেশ স্বাধীন হবার পরে। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে যাবার কথা একবারও ভাবেননি। তিনি ও তাঁর স্ত্রী জমিলা খাতুন তারক দত্ত রোডের বাড়িতেই বাস করতেন। কন্যা জেবুন্নিসা ও জামাতা অধ্যাপক শামসুল হুদা ঢাকায় থাকতেন। দুই পুত্র বোম্বাইএ থাকতেন। পত্নীর মৃত্যুর (১৯৫৫) পর তিনি কলকাতার বাড়িতে একাই থাকতেন। তখনো ঢাকায় ফিরে যাবার কথা ভাবেননি। পরিচারিকা ও উড়ে এসে জুড়ে বসা দুএকজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপর কিছুটা নির্ভর করে বাকি পনেরটা বছর (১৯৫৫—১৯৭০) চালিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই পর্বে তাঁর পত্নীর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কোনোদিন ফেলে-আসা ঢাকার জীবনের জন্যে আক্ষেপ করেননি। মেয়ে-জামাই-নাতির সঙ্গে অল্প সাক্ষাৎ হয়, এজন্য তাঁর আক্ষেপ ছিল।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, তারক দত্ত রোডের দোতলার ঘরটিতে বসে হাস্য উদ্ভাসিত মুখে বাকি জীবনটা কী কী বিষয়ে লিখবেন, তারই আলোচনা করতেন। বলতেন, রবীন্দ্রনাথ, গ্যোটে ও হযরত মোহম্মদের জীবনী রচনা আর পবিত্র কোরআন-এর অনুবাদ বাকি আছে। এইসব কাজ কিছুটা এগিয়েছে, আশা করছেন বাকি জীবনে তা শেষ করে যেতে পারবেন। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় সুবিধা-অসুবিধার প্রসঙ্গ রোগ-ব্যাধি-প্রসঙ্গ একেবারেই আলোচনা করতেন না। হরেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হতো। সে আলাপনে ঢাকার ফেলে-আসা জীবন ও কর্মের কথা সামান্য জায়গা পেত, দুই বঙ্গের মধ্যে রাষ্ট্রিক বিরোধে উদ্বেগ প্রকাশ করতেন, চলতি দুনিয়ায় দেশে দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে আঘাতে উদ্বিগ্ন হতেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে এইসব

বিষয়েই আলাপ করতেন। আর মেয়ে-জামাই এলে অবশ্যই দাওয়াতের ছল করে ডেকে পাঠাতেন। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসের কথা তুললে বলতেন, ও কথা ভুলে যান, বলে হাসতেন।

দু বছর পূর্বে ঢাকায় গিয়ে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও আবদুল হক সম্পাদিত 'কাজী আবদুল রচনাবলী'র দু খণ্ড কিনে এনেছিলাম। সম্প্রতি অধ্যাপক নুরুল আমিন সম্পাদিত তৃতীয় খণ্ড হাতে এলো। নতুন করে ওদুদ সাহেবের সাহিত্যচর্চার কথা মনে পড়ছে। যে উপন্যাসটির কথা তাঁকে বারবার বলেও আদায় করতে পারিনি, তৃতীয় খণ্ডে সেটি পেলাম—'নদীবক্ষে' (১৯১৯)। এটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন—'উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষী গৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে' লেখক খুলে দিয়েছেন, তার 'স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে' তিনি যে 'বিশেষ আস্বাদ লাভ' করেছেন তাও লিখেছিলেন।

বাংলার মুসলমানদের নিয়ে অনেকদিন পূর্বে লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র—'মহেশ' ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস তার পরিচায়ক। আজাদীর পরে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তারপরই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও আরো অনেকে। বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা পূর্ববঙ্গের মুসলিম-সমাজকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, তা বলা বাহুল্য।

এঁদের সকলের পূর্বে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন 'নদীবক্ষে' উপন্যাসটি। তিরিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এর কাহিনী। কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদক যে কাহিনী-সারাংশ দিয়েছেন, তাতেই আমাদের কাজ চলে যায়।—

গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসের মূল সূত্র রচনা করেছে লালু ও মতির সম্পর্ক। কৃষক লালুর সঙ্গে তার চাচাতো বোন জমির শেখের কন্যা মতির সম্পর্ক আশৈশব। বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে-সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। উভয়ের মিলন-সংকেতও পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তরুণ কৃষিজীবী লালু ফসল ও হালের গোরু দুই-ই হারায়। অর্থনৈতিক সংকট কাটাবার জন্য লালু সুদূর বাখরগঞ্জে ধান কাটতে যায়। সেখানেও সারাক্ষণ মতির ভাবনা। অবশেষে অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে ধান নিয়ে গ্রামে ফিরলে লালু দেখে ইলিশমারি চরের অবস্থাপন্ন ফটিকের সঙ্গে মতির বিয়ে হয়ে গেছে। তবু আশাহত লালু অনিরুদ্ধ হয়ে মতিকে দেখে আসতে যায় এবং এক পর্যায়ে আত্মদ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত অবস্থায় নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করে। দুখের বোন পুটির সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব এলে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্তরে মতি-প্রেমে একনিষ্ঠ থাকে। ইতোমধ্যে অসুখে ফটিকের মৃত্যু হলে অকাল বিধবা মতিকে পিতার সংসারে ফিরে আসতে হয়। এবারে অত্যধিক পরিশ্রমে লালু অসুস্থ হলে তার সেবাশুশ্রূষায় মতি এগিয়ে আসে এবং এতে উভয়ের সম্পর্ক পুনরায় ঘনিষ্ঠতর হয়। লালু দেহে মনে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু লালুর মা ধীরে ধীরে অসুখে ভুগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মরণকালে তিনি লালু ও মতির মিলন কামনা করে যান। এরপর মতি তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়ে লালুর উপর। নৌকায় ফিরতে ফিরতে এক রোমান্টিক আবহে উভয়ের মিলন ঘণ্টা বেজে ওঠে।'

এই সংক্ষিপ্তসার থেকে আমরা অনুধাবন করি, কৃষিভিত্তিক নদীমাতৃক গ্রামসমাজের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরল বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে কাহিনীকে লেখক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কোথাও সুলভ রোমান্টিক উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি। মতিকে নিয়ে তার মামার বাড়ি থেকে নৌকায় ফিরে আসছে লালু। এখানে উচ্ছ্বাস সৃষ্টির যে সুযোগ ছিল লেখক তাতে প্রলুব্ধ হননি। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ'-এ (১৯১৬) যে মিলন ঘটাতে পারেননি, ওদুদ 'নদীবক্ষে' (১৯১৯) তা পেরেছেন। তার মূল কারণ হিন্দু আর মুসলমান সমাজের নানা বিধান ও নিষেধাজ্ঞা।

বাংলার মুসলমান কৃষকজীবনের এমন প্রাণবন্ত কাহিনী এর পূর্বে রচিত হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। আফসোস কাজী আবদুল ওদুদ এই পথ ছেড়ে মনন-চর্চা-পথে চলে গেলেন।

দুটি তরুণ তরুণীর পারস্পরিক আসক্তি প্রকাশে ওদুদ কখনই মুক্তকচ্ছ হননি। পুরো উপন্যাসটাতে শিল্পসংযম লক্ষণীয়।

ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরছে চাচা-ভাইপো জমির আর লালু। অদূরবর্তী বিল থেকে লালু পদ্মচাকা, ঢ্যাঁপ, পদ্মফুল, পদ্মের ডাঁটা সংগ্রহ করে নিয়ে এলো লালু। মুখ নিচু করে লালু জমিরের দাওয়ায় বসে সংগৃহীত পদ্মফুল পদ্মচাকা ঢ্যাঁপ বাছাই করছিল। পরিশ্রান্ত লালুকে মতি নিজের হাতের তৈরি 'বিন্নে'-ঘাসের পাখা এনে লালুকে বাতাস করছিল। জমিরের সঙ্গে আহারের নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে লালু ক'হাত দূরে নিজের বাড়িতে চলে গেল।

"লালু বারান্দায় খুঁটি হেলান দিয়া বসিয়া একটু উপরের দিকে অচঞ্চল অথচ তীক্ষ্ণতাশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। তাহার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইতেছিল, কোনো একটি চিন্তা লইয়া তাহার মনের ভিতরে যেন আন্দোলন চলিতেছিল, কিন্তু কোনো প্রকারের সুস্পষ্টতা আদৌ যেন সোজা হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শুধু কেমন একটা নূতন অনুভূতি তাহার সমস্ত মনের ভিতরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে গিয়া আবার লীন হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু কিসের এ অনুভূতি? কিসের জন্যই বা আজ তাহার মনের ভিতরে চিন্তার অস্পষ্টতার এই ধ্বস্তাধ্বস্তি?" (পরিচ্ছেদ ৪)

মতির জন্য লালুর ভালবাসার এই প্রথম স্ফূরণ লেখক অল্প কথায় সেরেছেন। এখানে ফেনিয়ে ফেনিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস সৃষ্টির সুযোগ লেখক প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুত পুরো উপন্যাসটাই সংযত। অপরপক্ষে—

"লালুর ব্যবহারের এই পরিবর্তন মতিকে যে একেবারে স্পর্শ করে নাই এমন নহে। অনাবিল নির্ঝরের মত লালুর সহিত তাহার একটা অতি সহজ প্রীতির যোগ···নাচিয়া নাচিয়া সামনের পানে চলিয়াছিল। কিন্তু যাহার স্রোতের উপরে আছাড় খাইয়া পড়িয়া হিল্লোল তুলিয়া সে মহা আনন্দে ছুটিতে চায়, তাহার পূর্বের সেই তরতর বেগ থাকিয়া থাকিয়া যে এমন একটা গভীর ঘূর্ণির মত হইয়া পড়িয়া তাহার নিজের গতির তাল ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা মতি মাঝে মাঝে লক্ষ্য না করিয়া পারে না।' (পরিচ্ছেদ ৫)

কিন্তু চাষের ব্যর্থতা ও হালের গোরুর মৃত্যুতে লালুকে বাধ্য হয়ে দূরবর্তী বাদা-অঞ্চলে ক্ষেতের কাজে যেতে হল। এটা লালুকে মতিকে খুবই নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ পায়নি। (পরিচ্ছেদ ৯)

লালুর অনুপস্থিতিতে ইলিশমারির চর থেকে এরফান মণ্ডলের ছোট ছেলে ফটিকের সঙ্গে মতির বিয়ের প্রস্তাব এলো। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মতো মনের জোর ও আর্থিক নিশ্চয়তা মতির বাপের ছিল না। অতএব শাদী হল। দেনমোহরের প্রস্তাবে 'কবুল' উচ্চারণ করতে মতির প্রাণ ফেটে যায়, তবু মতিকে তা করতে হল। এখানেও লেখক ব্যাপারটা অল্প কথায় সেরেছেন—"কখন যে মতির দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া কবুল কথাটি টুপ্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় মতি আদৌ মনে করিয়া রাখিতে পারিল না।" (পরিচ্ছেদ ১১)

সুদূর বাখরগঞ্জে ধানকাটা শেষ করে লালু দুমাস পরে যখন ঘরে ফিরে এলো, তখন তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে (পরিচ্ছেদ ১২)। এখানেও সুযোগ ছিল, লেখক দশ পাতা ব্যাপী উচ্ছ্বাসের বন্যা বইয়ে দিতে পারতেন। তা তিনি করেননি। কেবল সামান্য কথায় লালুর স্বপ্নভঙ্গের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন—"লালুর রক্তকরুণ চক্ষে টস্ টস্ করিয়া অশ্রু উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিল।" (পরিচ্ছেদ ১২)

মতির স্বামী ফটিকের আকস্মিক মৃত্যুর পরে লালুর উপরই ভার পড়ল মতিকে নিয়ে আসার। মেঘস্তম্ভিত আকাশের নিচে নৌকা চলেছে দুই আরোহীকে নিয়ে। লালুর চোখে মতি নতুন রূপে দেখা দিল—"মতির চোখমুখ, বসার ভঙ্গি লালুর হৃদয়ে অপার আনন্দরসের উদ্রেক করিতেছিল।" একটি মাত্র বাক্য লালু বলেছে—"মতি শীগগিরই তো আমাদের বিয়ে।" কোনো উচ্ছ্বাস নয়, লজ্জা নয়, দুজনের নৌকাযাত্রা "যেন এক সান্ধ্য হাওয়ায় ফুল ফুটিয়া গন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল।" (পরিচ্ছেদ ৩০)। এখানেই দুটি হৃদয়, দুটি মন এক হয়ে গেল।

ধূলিধূসর

অমর মিত্র

॥ বাইশ ॥

কালো বুড়ি ডাকে, ও মা, বউমা, কোনো চিঠি এল পিতিমা?

কোন্ চিঠি? চমকে ওঠে প্রতিমা। কালো পিসি কোন চিঠির কথা বলছে। যে চিঠি পাকিস্তান থেকে আসবে হরিমতি দাসী আর তার পাগল ছেলে হাজুর খবর নিয়ে। নাকি অন্য চিঠি যার অপেক্ষায় সে আছে। জ্যৈষ্ঠমাস পড়ে আধাআধি হলো। গরম কমে না। দালানের পাশে ফাঁকা জমিতে যে আউশ ধান করেছিল ইলা, মেজ দেওর নীলরতন, সে ধান কবে কাটা হয়ে গেছে। একটা পয়সাও তাকে দেওয়ার কথা বলেনি ইলা। কতয় বিক্রি হলো তাও বলেনি। ইলা পোস্ট অফিসে টাকা রাখছে, কানপাশা গড়ছে। গড়ুক। তাতে প্রতিমার কিছু যায় আসে না। তার তো একটা ছেলে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা জমানোর ভাবনাও নেই তার। মেয়েটারও যে কী হয়, আসেই না। বছর খানেক প্রায় এদিক মাড়ায়নি। এখন তার মেয়ের কথা খুব মনে পড়ে। মেয়ে যদি আসত, তার বাবার কথা বলা যেত। জামাই কী সব পার্টি করে বেড়ায়। তারও বড় একটা সময় নেই। এই তো ক'দিন আগে মেয়েকে চিঠি লিখেছে প্রতিমা সব জানিয়ে। জবাব তো আসবে একটা।

কালো বুড়ি বলে, আমার চিঠি না হোক তোর চিঠি? এল?

মুখ আঁধার করে মাথা নাড়ে প্রতিমা, মেয়েকেও চিঠি দিলাম, সেও তো আসে না।

কালো বুড়ি তখন বলে, তুই আয় দিনি, তোরে একটু সাজাই আমি।

বুড়ির এইরকম হয়। মাঝে মধ্যে আবেগ উথলে ওঠে। তাকে আদর করে তুই তোকারি করে, 'সোনার পিতিমা' বলে ডাকে। বারাণ্ডায় বসায় বড় বউটিকে। চিরুনি দিয়ে বউএর চুলের জট ছাড়ায়। চুলে ঘন করে নারকেল তেল মাখিয়ে দেয়। ইচ্ছে হলে গাল টিপে দিয়ে বলে, তুই তো শাউড়ি বটে, তোর মেয়ের বে হয়ে গেছে, কিন্তু কেডা তা বলবে তোরে দেখে, ও পিতিমা, তুই তোর খোকার বাবাকে লিখে দে একবার এসে ঘুরে যাক।

প্রতিমা বলে, পিসি তার খুব কাজ।

যত কাজ হোক, ছেলে বউএর খোঁজ নেওয়া সবচেয়ে বড় কাজ।

পিসি, তোমার ছেলে কেমন তা তো জানো। সে এখন মেতেছে সাতপাহাড়ি নিয়ে, কালিহাতিতে ওই দাঙ্গার সময় আমাকে ফেলে চলে যেত ঋণসালিশীর বিচারে, ওর কোনো চিন্তাই নেই, আমার পাহারায় থাকত তোয়াজ খাঁ, মুসলমান বুড়ো পিয়ন, ও বলে লোককে বিশ্বাস করলেই বাঁচা যায়।

অত শত বুঝিনে আমি। আসতে বল।

আসতে বলল প্রতিমা। ছেলেকে নিয়ে বসল দুপুর বেলায়, লেখ শুভ, বাবাকে চিঠি লেখ। শুভ বলে, ইংরিজিতে লিখবো মা?

ইংরিজি, কেন ইংরিজি কেন?

শুভ বলে, ইংরিজিতে চিঠি লেখা শেখালো সেদিন ইস্কুলে, লেটার রাইটিং, লিখি মাই ডিয়ার ফাদার।

প্রতিমা হেসে ফেলে। ডিয়ার মানে প্রিয়, প্রিয় তো বটেই, কিন্তু তা লিখতে হবে না, তুই বাঙলায় লেখ, আমি বলি তুই লেখ।

তুমি বললে তো তোমার চিঠি।

তাহলে তুইই লেখ, দেখি তুই কেমন লিখিস!

শুভ কাগজ কলম নিয়ে রবিবারের দুপুরে বসল। তার মা প্রতিমা বলল, তুই যে রীতিমত মহাভারত লিখতে বসলি শুভ।

শুভ বলে, সব কথা লিখতে হবে তো বাবাকে, আমার অনেক কথা আছে মা। কাগজ কলম হাতে ধরার পর বাবার

জন্য মন কেমন করছে শুভর।

শুভ সারাদুপুর ধরে কা চিঠিই না লিখেছে—বাবাকে। প্রতিমা পড়ে অবাক। বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। চিঠিটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পালিয়েছে ছেলেটা নিমাই-এর খোঁজে। পড়তে পড়তে শিহরিত হয় প্রতিমা। থরথর করে কাঁপে। এ কী তার ছেলের লেখা, না অন্য কেউ লিখেছে! কালো পিসি শোনো, তোমার নাতি কী লিখেছে…। কালো বুড়ি বলে, পড়ে শোনা দেখি কী চিঠি এলো।

আসেনি পিসি, যাবে এই চিঠি।

যাবে, তোর খোকার বাবার কাছে, তুই তাই শোনাবি? হি হি করে হাসে বুড়ি।

না পিসি, এটা শুভ লিখেছে। প্রতিমা বোঝায়। তারপর পড়তে থাকে, 'শ্রীচরণেষু বাবা…বৈশাখ গিয়ে জ্যৈষ্ঠ পড়িয়াছে, খুব উত্তাপ, আমতলীতে একটি পুষ্করিণী কাটা হইয়াছিল দুই বৎসর আগে, তাহা এই বৎসর প্রথম শুকাইয়াছে। বৈশাখ মাসে সেখানে পাঁক কাদা ছিল। এখন তাহা কঠিন মাটি, রৌদ্রে মাটি পুড়িতেছে, তুমি কখনো দুপুরে আসিবে না। দুপুরের রৌদ্রে তোমার কষ্ট হইবে। এই তো গত মঙ্গলবারে ডাকপিয়ন হরিদা সাইকেল করিয়া সোলাদানা হইতে ফিরিবার পথে অজ্ঞান হইয়া গেল।

তোমার সাতপাহাড়িতে কি বৃষ্টি হইয়াছে? তুমি আগেরবার যখন আসিয়াছিলে তখন বলিয়াছিলে ঐস্থানে লালমাটি। ঐস্থানে গরম খুব। তুমি ঐখানেও দুপুরে বাহির হইবে না। আমার শুধু মনে হয় ডাকপিয়ন হরিদার মত তুমি সাইকেল করিয়া দুপুরের রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছো। আমি ইদানিং দুপুরে বাহির হই না। এই সময় রাতটি খুব আরাম দেয়। আমি রাতের আকাশে কালপুরুষটি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তুমি তো দেখাইয়া দিয়াছিলে, কিন্তু ঠিক করিতে পারি না। শুধু জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া সপ্ত ঋষিকে চিনিতে পারি। বাবা তুমি কেমন আছো, আমার মন কেমন করে তোমার জন্য।

সেদিন মাকে বলিলাম কোনটা কালপুরুষ, ধনুর্বাণধারী যোদ্ধা তা দেখাইয়া দিতে, মা বলিল ভুলিয়া গেছে। মাও চিনিতে পারিতেছে না। মা বলিতেছে তুমি আসিয়া আবার চিনাইয়া দিবে। কালপুরুষটিকে দেখাইতে তুমি কবে আসিবে। আমার কখনো কখনো মনে হইয়া থাকে যে তুমি বোধহয় কালপুরুষটিকে লইয়া চলিয়া গিয়াছো সাতপাহাড়ি। কালপুরুষ যেন তুমি থাকিলেই এই ব্রহ্মপুরের আকাশে ফুটিয়া ওঠে। আমি আমতলীর বুড়ো পশুপতি দাদুকেও সেদিন সন্ধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদু তুমি কালপুরুষ দেখিতে পাও? দাদু বলিলো, চোখ ঝাপসা লাগে, শুভ তুই তোর বাবাকে একটা চশমা নিয়ে আসতে বলবি আমার জন্য। তুমি পশুপতি দাদুর জন্য চশমা লইয়া আসিবে। পশুপতি দাদু তাহার পর আমার কথায় সায় দিয়াছিল যে তাহা জানাই তোমাকে, যে তুমিই কালপুরুষ লইয়া চলিয়া গিয়াছো সাতপাহাড়ি। পশুপতি দাদু কহিয়াছে, শুভ তোর বাবা কালপুরুষের মত। কেন বলিলো?

বাবা আর একটা কথা বলি, তোমার কাছে অনেক কথা আছে আমার। নিমাইএর খুব দুঃখ। ওর সৎমা ওকে দেখিতে পারে না। নিমাইএর দুঃখর কথা নিমাই তোমাকে বলিবে। কাকু বলিয়াছে উহাকে আবাদে লইয়া যাইবে। কবে যাইবে তাহার ঠিক নাই। তুমি কি নিমাইকে সাত-পাহাড়িতে লইয়া যাইতে পারো না…।

কালোঠাম্মা একটি চিঠি লিখিয়াছে—পাকিস্থানে বিষ্টে-ভূত এবং হরিমতি দাসীর নামে। আমতলীতে বিষ্টেভুতের জন্য একটি নিমগাছ ও…।'

কালো বুড়ি বলল, থাম থাম, ও বউ থাম, এসব কি শুবো লিখেছে?

হ্যাঁ। অস্ফুট জবাব দিল প্রতিমা। কী সুন্দর লিখতে শিখেছে ছেলেটা।

কালো বুড়ি বিড় বিড় করে, হরিমতির চিঠি এলো না তো?

আসবে পিসি আসবে, তুমি শোনো কতটা লিখেছে ও, এতবড় চিঠি আমিও লিখতে পারব না পিসি, এত কথা আমার মাথাতেও আসবে না, ঠিক যেন লেখকের মত লেখা, ও পিসি শুনছো…, ঠিক যেন শরৎ বাবু, বিভূতি বাবুর মত!

প্রতিমা সেই চিঠি খামে ভরে পাঠাবে কী, দুদিন ধরে পড়ে পড়ে বিভোর হলো। নিজের সন্তান কী চমৎকার ভাব প্রকাশ করেছে ভাষায় ভাষায়। কেউ তো লিখে দেয়নি, সারাদুপুর ধরে নিজে নিজে লিখেছে। অন্ধকারে শুভ ঘুমোয়,

প্রতিমা জাগে।

হেরিকেন হাতে করে বাইরের বারান্দায় বসে প্রতিমা। বারান্দায় হেরিকেন রেখে উঠোনে নামে। নেমে আকাশে তাকায়। জ্যৈষ্ঠের আকাশ মেঘহীন। লক্ষ তারায় ঝলমল করছে। কালপুরুষ দেখতে চেয়েছিল বটে শুভ সেদিন, তার মন ভালো নেই, বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তুই খুঁজে নে শুভ, আমি চিনতে পারছি না। তোর বাবা আসুক, ভালো করে চিনে নিস।

কোথায় কালপুরুষ তুমি? কোমরে তলোয়ার হাতে ধনুর্বাণ যোদ্ধা কোথায় গেলে তুমি? প্রতিমা আকাশ দেখতে থাকে। আকাশ আকাশ, ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড।

বিয়ের পর তাকে আকাশ চিনিয়েছিল রামরতন। রামরতন তাকে কত কিছুই শিখিয়েছে। মুখে বলেনি সব কথা, কিন্তু আচরণের ভিতর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—এইভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আর তা শিখে কখনো সে নিজেই রামরতনকে টেক্কা দিয়েছে। কালিহাতির কথা মনে পড়ে তোমার কালপুরুষ? আমি না থাকলে তুমি পারতে? এখনো যে তুমি সাতপাহাড়িতে গিয়ে ধনুর্বাণ ধরে আকাশ থেকে মাটিতে নেমেছো, ভাঙছো রুক্ষ মাঠ, গরিবের ঘরে ঘরে খোঁজ নিচ্ছো কার কেমন কষ্ট, কত দুঃখ, তাও কি পারতে যদি না আমি তোমার…বলতে বলতে আকাশ থেকে মুখ নামায় প্রতিমা, আমি তো তোমার সঙ্গে নেই, তুমি একা একা কী করছো রামরতন! তখন তারার আলো বেয়ে যেন নেমে এল সাদা পাখি। সাদা পেঁচা নামল উঠোনের প্রান্তে, বউ ও বউ?

চমকে মুখ তুলল প্রতিমা, কে কে?

…চিনতে পারিস না?

তুমি তুমি! তুমি বলো দেখি আমি এখন কী করি, একা সে কী করে কী করছে ওখানে ভেবেই পাই না।

… বউ যা হবার হবে তুই ঘুমো।

ঘুমোব? কার ভরসায় ঘুমোব আমি, ও পাখি পাখি।

…কেন কালিহাতিতে ঘুমোতিস না?

ওখেনে তো ভরসা ছিল তোয়াজ খাঁ বুড়ো, এখেনে আমার কে আছে?

…দাঙ্গার ভিতরে মুসলমান তোর ভরসা ছিল, তাও আবার তার ভাষা বাঙলা ছিল না, পশ্চিমের মানুষ।

প্রতিমা ফিস ফিস করে, হ্যাঁ পশ্চিমের মানুষ। মানুষই ছিল সে পাখি, এখেনে আমি কাকে দরজার বাইরে বসিয়ে ছেলে বুকে ধরে ঘুমোই।

…আমি আছি বউ, তুই ঘরে যা, না ঘুমিয়ে সোনার প্রতিমা কালো হসনে আর, তোর চোখ দেখেছিস বউ, ক' রাত্তির ঘুমোসনি?

হিসেব করিনি, ওর শেষ চিঠিটা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে পাখি, আমার এমন কপাল, চিঠির কথাটা কাউকে বলতেও পারছিনে, ছেলে তো ছোটো। ও ছেলেকে আমি সেসব কী করে বলি, নিজে যে ভয় পেয়েছি তাই বা কী করে বলি, নিজে যে ভয়ে ঘুমোচ্ছিনে তাই বা বলি কী করে, পোড়ার কপাল আমার মেয়েটাও আসে না অনেকদিন, বড় সংসারী হয়েছে সে, মা ভাইএর কথা ভুলেই গেছে।

…ভোলেনি ভোলেনি সে আসবে। তুই ঘুমো বউ।

একা আমি ঘুমোই কী করে?

…তাহলে তোর খোকাকে বল।

আমি তো তাই ভাবছি বলবো কিনা, বললে ও সহ্য করতে পারবে কিনা, ওর সাহস আছে কিনা তাও তো জানিনে, তবে আজ চিঠি পড়ে মনে হলো মন খুব নরম, মনে ভালোবাসা আছে দয়া আছে, কিন্তু ওই নরম মন কতটা কঠিন হয়ে সহ্য করতে পারবে সব, তা তো জানিনে।

…পারবে পারবে, ও তোকে বুড়ো তোয়াজ খাঁর মত পাহারা দেবে, সাহস দেবে।

তাই! জলজলে চোখে প্রতিমা আকাশের দিকে তাকায়। ওই যে ডানা মেলে দিয়েছে রাতপাখিটি। বলতে বলতে যাচ্ছে, পারবে পারবে। প্রতিমা ঘরে ফিরে এল। দরজা দিয়ে ছেলের মুখ দেখল হেরিকেনের দম বাড়িয়ে, ডাকলো ও খোকা, ও শুভ শুভ।

শুভ পাশ ফিরল, উঠল না। সারাদিন মাঠে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, ওকে এখন কে জাগায়। প্রতিমা ছেলের পাশে শুয়ে পড়ল। রামরতনের শেষ চিঠির কথা প্রতিমা বলেনি কাউকে। খুব ঝামেলায় পড়েছে সে। পুকুর চুরি ধরে ফেলতেই সন্ত্রস্ত হয়ে প্রশাসন আবার আঘাত হানতে তৈরি হচ্ছে। রামরতন লিখেছে সে দুষ্টচক্রের খেলাটা ধরে

ফেলেছে। রাস্তা তৈরি হয়নি, কিন্তু সেবাবদ পাঁচ হাজার টাকা খরচ দেখানো আছে নথিপত্রে। তাকে সদর শহরে ডেকে নিয়ে গিয়ে উপরওয়ালা বড় সায়েব শাসিয়েছে। তার শাসানিতে রামরতন মনে মনে ঠিক করেছে সে তার লক্ষ্য থেকে সরে আসবে না। সে এবার সাপের লেজে পা দিয়েছে সত্যি। এর ফলে তার চাকরির ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, আবার সে স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেও পারে, যেমন দাঁড়িয়েছিল কালিহাতিতে। রামরতন লিখেছে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকে যেন প্রতিমা। যদি সাসপেণ্ড হয় তো সে ব্রহ্মপুরে ফিরে চাষবাস করবে না হয়! হাসে প্রতিমা। চাষবাস! করলেই হলো? কাজটা কি অত সোজা? চাকরি ছেড়ে চাষবাস করা যায়? সে ভাবছিল লিখে দেবে, ফিরে এসো ক'দিনের জন্য, ফিরে এসে আমার কথা শোনো···। ঘুমিয়ে পড়েছে প্রতিমা।

পরদিন সকালে হঠাৎ অবনীভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, চিঠি এলো বউমা?

মিথ্যে বলতে পারল না প্রতিমা, ঘাড় কাত করল, হ্যাঁ এসেছে।

বলোনি তো? অবনীভূষণ বিরক্ত হলেন, কী লিখেছে?

আসতে দেরি হবে।

তুমি আসতে লেখোনি?

লিখেছিলাম। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় প্রতিমা।

কী লিখেছিলে? অবনীভূষণ অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আসতে, আপনার কথা লিখেছিলাম।

তবু আসছে না! দেরি হবে কেন?

অফিসে খুব গোলমাল। প্রতিমা ভাবে, শ্বশুরমশায়ের সব জানা উচিত।

গোলমাল! কেমন হতভম্বের মত তাকিয়ে আছেন অবনীভূষণ। গোলমাল তো লেখেনি আগে, লিখেছিল, বাঁকুড়া শহর থেকে তাকে সাতপাহাড়িতে পাঠিয়েছে।

সাতপাহাড়ির অফিসে খুব গোলমাল বাবা, এখনই অফিস ছেড়ে আসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিমা ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে। স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্বশুরমশায়ের জানা উচিত। তাঁরা যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করেছিলেন, সেই স্বাধীনতায় মাথা উঁচু মেরুদণ্ড সিধে করে থাকা কত কঠিন!

গোলমালটা কিসের, ও যেখানে যায় সেখানে গোলমাল! বিরক্ত হয়েছেন অবনীভূষণ।

ওঁকে তাহলে সব মেনে নিতে হবে! প্রতিমা বলল।

তুমি খুলে বলো দেখি বউমা, কী লিখেছে রাম?

প্রতিমা বলল। ধীরে ধীরে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করে করে বলল সব। শেষে বলল, ওঁর মত মানুষ টিকবে কী করে বাবা, টিকতে হলে সব মেনে নিতে হয়।

না না, মানবে কেন? তবু···। অবনীভূষণ চিন্তিত।

তবুর কোন ব্যাপার নেই বাবা, ওকে সব মেনে নিয়ে ঘুষ খেতে হবে।

ঘুষ! আঁতকে উঠেছেন অবনীভূষণ, ঘুষ খাবে কেন আমার ছেলে?

তা না হলে এইরকম হবেই।

হবে কেন? আচ্ছা তুমি ওকে আসতে বলো বউমা, ক'দিনের ছুটি নিয়ে আসুক। বুড়ো বাবা ছেলে বউকে দেখতে তো ছুটি দেবে?

প্রতিমা শুনে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন আবার ডাকলেন অবনীভূষণ, ওকে কি ঘুষ দিতে আসছে লোকে? আচ্ছা ঘুষ না নিয়েও তো কাজ করা যায়?

আমি ঠিক জানি না বাবা, চিঠিতে যা লেখা আছে তাই-ই বলছি।

না, আমি বলছি না ও ঘুষ খাক, শোকের ব্যাপার হবে তা, আমি ফ্রিডম ফাইটার অবনীভূষণ বসু, আমার ছেলে অসৎ হতে পারে না, এ আমি জানি বউমা।

ওর বসের সঙ্গে গোলমাল লাগছে। প্রতিমা বলল।

বসের সঙ্গে গোলমাল! কই আগে বললে না তো?

ওর বস ওকে বারণ করছে, ওসবে মন দিতে না করছে। ও লিখেছে ওর বসও জড়িত এর সঙ্গে, সাতপাহাড়িতে ও ভালো নেই বাবা। প্রতিমার গলার স্বর ভারী।

অবনীভূষণ বললেন, এ তো তুমি নতুন কথা শোনাচ্ছো বউমা, উপরওয়ালার সঙ্গে গোলমাল—ওসব করে কি চাকরি করা যায়। ঘুষ তো অনেকে নেয় না, তা বলে বসের সঙ্গে বিরোধে যাবে কেন? সি. সি. আর. মানে কনফিডেনশিয়াল

ক্যারেকটার রিপোর্ট—তা খারাপ হয়ে গেলে ও তো জীবনে আর প্রমোশন পাবে না। আমি এসব ভালো বুঝছি না। ও কি বাচ্চা ছেলে! তুমি ওকে ভালো করে লেখো, পত্রপাঠ যেন চলে আসে, আমি শুনতে চাই সব, ওকে বদলি করে আনতে হবে ওখান থেকে, দরকারে আমি চিফ মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টারকে চিঠি লিখবো।

অবনীভূষণ পায়চারি করতে থাকেন। প্রতিমা বেরিয়ে এসে দেখল দরজার বাইরে ইলা। ইলা তাকে ধরল, ও দিদি কী, হয়েছে? বড়ঠাকুরের খবর এয়েচে নতুন কোন? তুমি ওঁকে আসতে বলো!

বলছি তো। প্রতিমা এবার বিরক্ত হয়। না এলে কি আমার ভালো লাগে!

না, না, আমি সে কথা বলছি না। ভালো করে লেখো। বিদেশবিভুঁয়ে গিয়ে একা একা কী করে বেড়াচ্ছেন—পুরুষ মানুষ তো!

প্রতিমা কঠিন চোখে তাকায়। তার দৃষ্টিতে কুঁকড়ে যায় ইলা। প্রতিমা ধীর পায়ে বাইরের বারান্দায় আসে। রাস্তায় তার চোখ। রাস্তা দেখতে থাকে সে। মনে হয়, ওই রাস্তা ধরে যেন রামরতন আসছে। রামরতন নয়, এলো নীলরতন।

নীলরতন বাড়ি ফিরে জামাকাপড় না ছেড়ে নাড়ুকে খুঁজল। নাড়ু নেই, শুভ আছে। যা দেখি শুভ, কাওড়া পাড়া থেকে নিবারণকে ডেকে নিয়ে আয়। রিকশা নিয়ে চোঁ করে চলে আসে যেন। আর হ্যাঁ, নিবারণকে বলিস ভেলো-লেলোকে খবর দিতে।

হাঁটতে হাঁটতে শুভ গেল নিমাইদের পাড়ায়। পেল না নিবারণকে। নিবারণকে পাওয়া খুব সহজ—যদি দেখা যায় রিকশা আছে তো সে আছে, রিকশা না থাকলে তো নিবারণের থাকার সম্ভাবনা একশোভাগ নেই। তবে হ্যাঁ, রিকশা আছে সে নেই—এমন তো হয়েছে। কাহারাপাড়া থেকে শুভ গেল আমতলীর দিকে। যা ভেবেছে ঠিক তাই। আমতলীর পথের ধারে বুড়ো আমগাছটির ছায়ায় নিবারণের রিকশা মানে তার কাকা নীলরতন বসুর রিকশা ঘুমোচ্ছে। শুভ আমতলীতে ঢুকে বাটুল দাসের চায়ের দোকানে খোঁজ নিল, নিবারণদা আছে এখেনে?

তারা মাথা নাড়ল। মাথা নাড়ুক, শুভ জানে কোথায় থাকতে পারে নিবারণ কাহার। আমগাছের নিচে রিকশা ঘুম পাড়িয়ে সে ঠিক গেছে বীরেন বিশ্বাসের বাড়ি। আছে কি বীরেন বিশ্বাস? নাকি সে খোল-করতাল নিয়ে বাইরে গেছে? একটু শক্ত হয়ে ওঠে শুভ। শিহরণ টের পায় যেন গায়ে। দ্রুতপায়ে কলোনির প্রান্তে পৌঁছতে যাবে তো পথেই দেখা বীরেনের সঙ্গে, আরে বড়বাবু যে, যাচ্ছো কোথায়, তুমার নোতন কাকির কাছে আমি সব শুনিচি। তেনার জ্বর হয়েছে। আজ আর সে কাজ নেই।

তোমারে কাকা ডাকছে। শুভ বলল।

মেজদা এয়েচে। এ্যাই মরেচে, আমি যে আজ রিকশায় করে তোমার নোতন কাকিরে বসিরহাট নে যাব, কুইন সিনেমায় সে 'প্যার কিয়ে যা' দেখতে যাবে।

তুমি যে বললে জ্বর এয়েছে!

এয়েছে এয়েছে, ও তুমি বুঝবা না। ঝপ করে তার হাতটা চেপে ধরেছে বীরেন, ও বড়বাবু, টগরফুল কেমন দেখেছো, তুমি তো কম স্যায়না হওনি!

শুভ ছিটকে সরে যায়, আবোলতাবোল কী বলছো নিবারণদা?

হি-হি করে হাসে নিবারণ, স্যায়না বলতি স্যায়না—তুমি খুব চালাক, উঠতি বসতি বীরেনের বাড়ির দিকে যাওয়া! দুপুরবেলায় কী করতি গিইলে সেদিন?

শুভ ঘামছে। নিবারণ হাসতে হাসতে আবার তার হাত ধরেছে, না রে শুবো, আমি য়্যাকি করছি, টগর বলছিলো কিনা তোর কথা। দুপুরি তো হাজির হইছিলি, তা ওই টগর বউডা কেমন বল দিকিনি?

শুভ এতদিনে নাম জানল, বীরেন বিশ্বাসের বউএর নাম টগর। নাকি এটাও এই নিবারণের দেওয়া! আগে বলেছিল সোনাই, এখন তা টগর। গুনগুন করে গান গাইছে বীরেন, এবার মলে সুতো হবো/তাঁতির বাড়ি চল্লে যাবো। পাছাপেড়ে শাড়ি হয়ে/উঠবো তোমার কোমরে... হি হি, ও শুবো, তোর খুড়ো ডাকে কেন?

তুমি নিমাইএর বাবা আর জেঠারে খবর দিয়ে এক্ষুনি এসো নিবারণদা।

নিবারণ দাঁড়ায়, ওদের খবর দেব কেন?

জানিনে আমি। শুভ জোরে হাঁটে।

আরে দাঁড়া দাঁড়া। ওরা তো কেউ নেই, কচ্ছম মারতি বেরুয়েছে। বুড়োটা আছে বটে, না না, বুড়োও গেছে, ওঠ তুই আমার রিশকায়।

শুভকে নিয়ে রিকশায় প্যাডেল করল নিবারণ, বলল, বড়বাবু, তুমি বলবা অনেক খুঁজা হলো কিন্তু তারা নেই। মানে লেলো জেঠা আর ভেলো কাকা।

তুমি তো খুঁজলেই না, মিথ্যে বলবো কেন?

বলো বড়বাবু, নিমে তো তুমার স্যাঙাৎ—আচ্ছা তুমি সামনে থেকো না, যা বলার আমি বলব।

[ক্রমশ]

আর হয় না

অন্নপূর্ণা ঘোষ

মনে মনে পেরিয়ে যাই
কত গহন সমুদ্র—কত দেশ বিদেশ
দীর্ঘপথ পরিক্রমা ;
দেখি চেরীফুল ফুটেছে ফুজিয়ামার উপত্যকায়
তুষার গলে গলে পড়ছে কুমেরুর
সাদা কূর্ম পিঠে।
নরম ঢেউএর স্মৃতির সমুদ্র পার হয়ে যেতে চাই
তোমার কাছে—
সেদিনের সেই শহরতলীতে
যেখানে দুজনে কত ঘুরে বেড়িয়েছি—
কতটা বাস্তব—কতটা মনে মনে
অনেক অনেক কথা ছিল সেদিন বলা হয়নি।
সময় ছিল অফুরন্ত
কিন্তু কথার স্রোত ছিল রুদ্ধ
ছিল কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত—আত্মপ্রকাশে দীন, অর্বাচীন—
এখন লজ্জা পাই সেদিনের লজ্জার।
মনে মনে পেরিয়ে যাই অন্তহীন কালের সমুদ্র
কিন্তু সেদিনের তীরে নোঙ্গর ফেলা
আর হয় না।
খুঁজে পাই না আর ফিরে যাবার পথ
সে পথে কখন যবনিকা পড়ে গেছে
শেষ অঙ্কের পরে।

হে অতীত কথা কও

(সপ্তম পর্ব)

বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জেহাদ ঘোষণা করলেন কায়েদে আজম জিন্না—হাতে তাঁর 'উদ্যত পিস্তল'।

সারাভারতে দুটি মাত্র প্রদেশ—বাংলা ও সিন্ধু ছিল লীগ মন্ত্রীসভার শাসনাধীনে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন সরকারী ছুটির দাবি জানালেন তাঁরা। সিন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলেন গভর্ণর, বাংলায় ১৬ই আগস্ট ছুটি ঘোষিত হল।

প্রচার করা হয়েছিল—মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পাকিস্তানের দাবি মেনে না নেওয়ার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কংগ্রেস বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, তবুও মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বরূপ সম্বন্ধে জনমানসে কিছু প্রশ্ন জেগেছিল। জিন্নাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কোন্ পথ বেছে নেবে—হিংসা না অহিংসার পথ? জিন্না উত্তর দিয়েছিলেন, "I am not to discuss ethics." অর্থাৎ "নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় আমি রাজী নই"।

১১ আগস্ট বাংলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, "আমাদের পরিকল্পনা এখনও স্থির হয়নি, তবে Direct action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে কি বোঝায় তা বাংলার মুসলমানরা জানেন—তাঁদের আর নতুন করে কিছু বোঝাতে হবে না।"

কলকাতার মেয়র এস এন উসমান অতি সহজ সরল মানুষ, তিনি অতি সহজ ভাষায় বললেন, "The day for an open fight which is the great desire of the Muslim Nation has arrived. By fighting you will go to heaven in this holy war. Let us all cry our victory to Pakistan, victory to the Muslim nation, and Victory to the army which has declared Jehad."

বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী 'কর্মবীর'—তিনি অল্প কথার মানুষ, তাঁর সহচরদের ডেকে শুধু বললেন, মিছিলের ধ্বনি হবে—"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"।

বাংলার লাট লর্ড লিটনের খুব কাছের মানুষ ছিলেন স্যার আবদার রহিম। কেমন করে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনে লিটনকে সাহায্য করেছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। সেই ১৯২৬ সালে কলকাতায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে শ্বশুর স্যার আবদার রহিমকে প্রভুত সাহায্য করেছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র তরুণ হোসেন শাহিদ সুরাবর্দী, তারপর থেকেই বাংলার রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দুই মহানায়ক মহম্মদ আলি জিন্না ও হোসেন শাহিদ সুরাবর্দী—দুজনেই ছিলেন অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ১৯৪৬ সালে আপন আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একের অন্যকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

জিন্না চেয়েছিলেন খণ্ডিত ভারতে পাকিস্তান—তা সে পাকিস্তান যতই কীটদষ্ট হোক না কেন! সুরাবর্দীর লক্ষ্য ছিল আসাম-সহ সমগ্র পূর্ববঙ্গ এবং বর্ধমান বিভাগ ছাড়া কলকাতা-সহ প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত এক অখণ্ড সার্বভৌম বঙ্গদেশ। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য প্রয়োজন কায়েদে আজম জিন্নার অকুণ্ঠ সমর্থন—তা তিনি পেয়েছিলেন। আরও একটি লক্ষ্য ছিল সুরাবর্দীর, ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গেলে ২০,০০০ ইংরেজ বণিকের উত্তরসূরী হবে কারা? সুরাবর্দী (অবশ্য বেনামিতে), ইস্পাহানী, সিদ্দিকিরা—না টাটা, বিড়লা, সুরযমল নাগরমল, কানোরিয়া, বাজো-রিয়ারা? অতএব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অপরিহার্য। রণক্ষেত্র বাংলা, সংগ্রামের প্রধান নেতা হোসেন শাহিদ সুরাবর্দী।

১৯৪৬ সালে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়েছিলেন বাংলার প্রধান মন্ত্রী। রাজাবাজার, কলুটোলা, পার্কসার্কাস, এবং হাওড়ার বস্তি অঞ্চলে প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দীর অবাঙালী

মুসলমান গুণ্ডাসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া ১৬ আগস্টের অব্যবহিত পূর্বে ভারত শাসন আইনে বন্দী দু হাজার গুণ্ডাকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই বিশাল গুণ্ডাবাহিনী পরিচালনার জন্য আনা হয়েছিল সুরাবর্দীর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু কুখ্যাত মীনা পেশোয়ারীকে (যিনি ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও গুণ্ডাদলের নেতা ছিলেন)।

বাংলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের চাকরিক্ষেত্রে প্রচুর weightage দেওয়া হয়েছিল। বাংলার পুলিস বিভাগে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল, তা সত্ত্বেও স্থরাবর্দী বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বহুসংখ্যক মুসলমান এনে পুলিসে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। বেছে বেছে এদের এমন সব এলাকায় কর্মনিযুক্ত করা হয়েছিল যেখানে গুণ্ডারা বিনা বাধায় তাদের তাণ্ডব চালিয়ে যেতে পারে, পুলিসের দিক থেকে কোন বাধা না আসে।

Leonard Moseley তাঁর "Last days of British Raj" গ্রন্থে স্থরাবর্দী-চরিত্রে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন—'Suhrawardy was a party boss of the type who believes that no politician need ever be out of office once his strong armed squads have gained control of the polling booths; that no minister should even suffer financially being in public life; that no relative or political cohort should ever go unrewarded. He loved money…and he was reputed to have made a fortune during the war.…… To this outwardly affable but inwardly ruthless politician the decision of Mr. Jinnah to declare 16 August 1946 as 'Direct action day' seemed a golden opportunity to demonstrate his power over Bengal's Muslims and his enthusiasm for Pakistan'.

১৬ আগস্ট কলকাতায় ভারত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ছয় মাস আগে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অফিসারদের বিচারের প্রতিবাদে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে একই সঙ্গে পথে নেমেছিল, তাদের মিলিত রক্তে রাঙা হয়েছিল কলকাতার রাজপথ। হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রবলে তারা বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হল? কোথায় লেখা আছে সে মন্ত্র? বেদে, পুরাণে, কোরাণ শরীফে, হাদীশে না শরিয়তে?

হাওড়া, মৌলালী, পার্কসার্কাস, মেটেবুরুজ থেকে দলে দলে লোক মিছিল করে চলেছে, সামরিক শৃঙ্খলায় ময়দানের দিকে, মুখে তাদের ধ্বনি "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান", হাতে দীর্ঘ বংশদণ্ড, তার মাথায় উড়ছে মুসলিম লীগের পতাকা। অনেকের হাতেই শুধুই লাঠি অথবা লোহার রড থেকে শুরু করে ছোরা, তরোয়াল, নানাবিধ কুটিরশিল্পজাত অস্ত্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত কিছু বেআইনী হাল্কা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। মিছিলের অধিকাংশই অকটারলোনী স্মৃতিস্তম্ভের (শহীদ মিনার) দিকে অগ্রসর হল। কিছু লোক থেকে গেল ধর্মতলা চৌরঙ্গী এলাকায়, শুরু হল বেছে বেছে হিন্দুদের দোকানগুলির লুণ্ঠন আর নির্বিচারে হিন্দুনিধন। এক অসহায় বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে কিছুক্ষণ লোফালুফি করার পর তাঁর মস্তকটি চুর্ণ করে দেওয়া হল একটি লৌহদণ্ডের আঘাতে। পুরসভার এক কর্মী পথে বেরিয়েছিল জঞ্জাল পরিষ্কার করতে, তাকে তাড়া করে প্রথমে লাঠির আঘাতে তার পা-দুটি ভেঙে দেওয়া হল, মাটিতে পড়ে সে যখন ছটফট করছে তখন একজন এসে তার কণ্ঠনালিটি কেটে দিল। পুরসভার কর্মীটির অপরাধ সে হরতালের দিন কাজে বেরিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল চৌরঙ্গী স্কোয়ার এলাকায়—শহরের কেন্দ্রস্থলে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ও প্রাক্তন সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে সেদিন দিল্লী যেতে হবে কার্যকরী সমিতির জরুরী সভায় যোগদান করতে। শরৎবাবু গভর্নর বারোজকে অনুরোধ করেছিলেন অবিলম্বে দাঙ্গা দমনের ব্যবস্থা করতে এবং তাঁকে ও মৌলানা আজাদকে মিলিটারী পাহারায় দমদম বিমানবন্দরে পৌছে দিতে। ছোটলাট বারোজ রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু কথা রাখেননি। মৌলানা আজাদ কোনক্রমে স্ট্রাণ্ড রোডের বড় বড় অফিস বাড়িগুলির সশস্ত্র ভোজপুরী দারোয়ানদের হাত এড়িয়ে বিমানবন্দরে পৌছে

দেখেন সেখানে বহু সৈন্য বোঝাই বেশ কিছু মিলিটারী ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, দাঙ্গা দমনের চেষ্টা না করে তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? উত্তর পেলেন, তাদের শুধু প্রস্তুত থাকতেই বলা হয়েছে, কোনরূপ action নিতে বলা হয়নি।

সকাল থেকেই শহরের রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল, তবে মুসলিম লীগের পতাকা উড়িয়ে বহুসংখ্যক লরি ও মোটরগাড়ি যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছিল এবং এগুলি থেকে হিন্দুদের দোকান ও বাসগৃহে আগুন লাগাবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে পেট্রল ও কেরোসিন সরবরাহ করা হচ্ছিল। কলকাতার রাজপথে সেদিন আর একটি বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল—কোথাও কোন পুলিস দেখা যায়নি। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের জন্য লড়াই পরিকল্পনা অনুযায়ীই চলেছিল, কিন্তু হিন্দুরা যখন দেখল পুলিস বা মিলিটারী তাদের কোন সাহায্যই করবে না—তখন তারা সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এল আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উন্মাদনা। অক্টারলোনী স্মৃতিস্তম্ভের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে অসংখ্য মানুষ—মুসলিম লীগ তার বাহুবল ও জনবল প্রমাণ করার জন্য আজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছে। ছোট বড় বহু মুসলিম লীগ নেতার সমাবেশ হয়েছে বিশেষ করে পূর্ব-বঙ্গের জেলাগুলি থেকে স্থানীয় নেতারা এসেছেন আন্দোলন সার্থক করতে। বেলা দুটোর সময় প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সভায় এলেন এবং বক্তৃতামঞ্চে উঠে অভূতপূর্ব জনসমাবেশে আনন্দিত হয়ে জনগণকে ধন্যবাদ দিলেন। এদিকে তখন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, টেরিটি বাজার প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দুদের দোকান ও বাসগৃহগুলি জ্বলছে। সভাস্থল থেকে আগুনের শিখা ও ধূম্রজাল স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে বহু নিপীড়িত মানুষের আর্ত চিৎকার। সভার পরই সুরাবর্দী লালবাজার কণ্ট্রোল রুমে গেলেন এবং নিজেই থানাগুলিকে ও ভ্রাম্যমাণ পুলিসদের নির্দেশ দিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কি নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি? লালবাজার কণ্ট্রোল রুমে একটি বৃহৎ বোর্ড (Incidents board) থাকে, তাতে জরুরী অবস্থার সময় ভ্রাম্যমাণ পুলিস ও থানা-গুলি থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে রাখা হয়। ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট সুরাবর্দী কণ্ট্রোল রুমে ছিলেন এবং এই তিনদিন বোর্ডটি ছিল একেবারেই শূন্য। শহরের বহু অঞ্চলে যখন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন চলছিল তখন পুলিস ছিল নির্বিকার। তাদের ওপর আদেশ ছিল—তারা যেন এসব রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। লর্ড ওয়াভেলের হিন্দুবিদ্বেষ ও মুসলমানপ্রীতি কারও অজানা ছিল না, তিনিও তাঁর ডায়েরীতে ২৭ আগস্ট তারিখে লিখেছেন "The chief point to my mind was Suhrawardy's communal presence in the control room on the first day with many M. League friends and his obvious communal bias."

বাংলা গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগের অধ্যক্ষ পি. এস. মাথুর সেদিনই বিকেলে লালবাজার যাওয়ার পথে সঙ্গী সার্জেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শহরে এত গোলমাল—পুলিস তা দমন করার চেষ্টা করছে না কেন? উত্তর পেয়েছিলেন, লালবাজার কণ্ট্রোল রুম থেকে নির্দেশ না পেলে আমাদের কিছু করার আদেশ নেই। অন্যান্য পুলিস সার্জেন্টদেরও একই অবস্থা।

জাগতিক নিয়মে প্রত্যেক কর্মকাণ্ডেরই একটি প্রতিক্রিয়া হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুপুরের আগেই হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ভবানীপুর অঞ্চলে হিন্দু ও শিখেরা একত্র হয়ে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল।

ভবানীপুর অঞ্চলে বহু শিখের বাস, পরিবহনের ব্যবসা তাদের। লরি ও ট্যাক্সির মালিক ও চালক শিখেরা একই সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। তখন ভবানীপুর অঞ্চলে, হাজরা রোডের মোড়ের কাছে নফর কুণ্ডু রোডে থাকি, বাড়িটির ঠিক সামনেই ছিল এমনি একটি বিশাল খোলা গ্যারেজ। ১৬ আগস্ট সকালে উঠে দেখি একটা ট্যাক্সিও বের হয়নি। বিশাল ট্রাকগুলিতে দলে দলে শিখেরা বেরিয়ে যাচ্ছে—হাতে তাদের উন্মুক্ত কৃপাণ। কিছুক্ষণ পর পরই তারা রক্তাক্ত কৃপাণ হাতে ফিরে আসছে—আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম সারা কলকাতা শহর মুসলমান গুণ্ডাদের কবলে, নির্বিচারে হিন্দুনিধনে নেমেছে তারা। পুলিস নিষ্ক্রিয়। দলে দলে মুসলমান গুণ্ডা হওড়ার পোল

পার হয়ে কলকাতায় আসছে। বিপদে পড়েছে যারা ভোরের ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছে, শিখেরা মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসছে (অবশ্যই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে)।

একটু পরেই খবর পেলাম—কালাচাঁদ মিস্ত্রির বিরাট জুতোর দোকানটি ভেঙে সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করা হয়েছে, লুণ্ঠিত হয়েছে ঐ অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানের দোকানগুলি। কালীঘাট পার্কের কাছে কয়েকটি মুসলমান পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের বাসগৃহ। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয়ছাত্র ডঃ কুদ্‌রৎ ই খুদার বাড়িও আক্রান্ত হয়েছিল তবে পল্লীর শিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারের অন্য সকলকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

এ তো প্রতিবাদ প্রতিরোধ নয়, এ যে পৈশাচিক হিংসা ও প্রতিহিংসার উন্মত্ত প্রকাশ! তৎপর হয়ে উঠল হিন্দুগুণ্ডার দল। যেসব অঞ্চলে মুসলমান অধিবাসীরা সংখ্যালঘু, সেসব অঞ্চল থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডারা নিজেরা নিরাপদে থেকে প্রবৃত্ত হল পৈশাচিক নরহত্যা, লুণ্ঠন, বহ্ন্যুৎসব ও নারীর উপর অত্যাচারে।

সুরাবর্দী এতখানি প্রতিক্রিয়া আশা করেননি, তিনি মনে করেছিলেন হিন্দুরা কাপুরুষ, ভীরু এবং সহজেই তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে বাংলায় নিরঙ্কুশ মুসলিম রাজপ্রতিষ্ঠা করা যাবে। হিন্দু ও শিখের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রস্ত হলেন সুরাবর্দী। এবারে তিনি নগর রক্ষার্থে সৈন্যদলকে আহ্বান করলেন, ১৭ আগস্ট। সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারী করা হল সারা কলকাতা শহরে। হিন্দুপল্লীগুলিতে যুবকেরা রক্ষীদল গঠন করেছিল। সুরাবর্দী পুলিসকে নির্দেশ দিলেন, রক্ষীদলের ঘাঁটিগুলিতে হানা দিয়ে হিন্দু যুবকদের গ্রেপ্তার করতে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ্য, স্বাধীনতা লাভের ঠিক প্রাক্কালে পল্লীতে পল্লীতে এই রক্ষীদলকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হল নানা শ্রেণীর ভদ্রবেশী বেকার যুবক, যারা ক্রমে পরিণত হল রাজনৈতিক দলগুলির 'muscle-man' বা 'পেশীমানব'এ। নির্বাচনের সময় অপরিহার্য হয়ে উঠল এরা এবং রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়ে 'দাদা'দের স্নেহচ্ছায়ায় ব্যবসায়ীমহল ও ভদ্রসমাজের আতঙ্ক হয়ে উঠল। কখনও এরা ক্যাডার (cadre), আবার কখনও বা কংগ্রেস দলের স্বেচ্ছাসেবক; শুধুমাত্র গায়ের জামাটি বদল করলেই হল।

প্রতিহিংসাস্পৃহা মানুষকে কতখানি নির্মম করে তুলতে পারে তা প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা ম্যাডক্স স্কোয়ারের বিপরীত দিকে ডাঃ অজয়কৃষ্ণ আচার্যের বাড়িতে বসে আমরা কয়েকজন বন্ধু দাঙ্গা সম্বন্ধেই আলোচনা করছি, এমন সময় একজন মধ্যবয়স্ক পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কাছে এল—মুখে তার ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট এবং ঠিক তার পেছনেই এল এক বাঙালী বীর হিন্দু যুবক, ক্ষীণকায়, হাতে একটি লোহার ভোঁতা বর্শা। সে মুসলমানদের হিন্দুনিধনের প্রতিশোধ নেবে লোকটিকে হত্যা করে। শিখণ্ডীর উত্তরসূরী হিন্দু যুবকটিকে বললাম, "নিরপরাধ নিঃসহায় মানুষকে হত্যায় বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, তোমার যদি সাহস থাকে তাহলে যেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে সেখানে গিয়ে তাদের সম্মুখীন হও, সেটাই বীরোচিত কাজ হবে। যুবকটি লোকটির দিকে একবার চেয়ে দেখে 'যা আজ খুব বেঁচে গেলি' বলে স্থানত্যাগ করল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানটিও চলে গেল। যতক্ষণ ছিল কোন কথাই সে বলেনি আমাদের কোন অনুরোধও করেনি এতই ভয় পেয়েছিল সে। আমরা একটি সৎকার্য করার গর্ব অনুভব করলাম। পরদিন সকালবেলা ঐ মুসলমানটির ভোঁতা বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল ম্যাডক্স স্কোয়ার পার্কে। সেদিন কর্তব্যচ্যুত হয়েছিলাম আমরা, লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থানার আশ্রয়ে রেখে আসা উচিত ছিল। সে গ্লানি এখনও মাঝে মাঝে মনকে পীড়িত করে।

চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার ও হানাহানির মধ্যেও বজ্রগর্ভ ঘনকৃষ্ণ মেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারণের ন্যায় মানবআত্মার অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে—মুসলমান প্রাণ দিয়েছে তার হিন্দু প্রতিবেশীকে রক্ষা করার জন্য, আবার হিন্দুও প্রাণপণে তার মুসলমান প্রতিবেশীকে রক্ষা করেছে নির্মম মৃত্যুর কবল থেকে।

একটু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। বন্ধু ডাঃ শান্তি ঘোষের (কম্যুনিস্ট হওয়া সত্বেও ইনি ছিলেন সর্বরকম মত-সহিষ্ণু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক) সঙ্গে পার্কসার্কাস অঞ্চলে গিয়েছি শান্তির বাণী প্রচারে তাঁরই গাড়িতে। রাস্তায় বৃষ্টির জমা জলে গাড়িটি গেল অচল হয়ে। গাড়ি থেকে নেমে ঠেলেঠুলে সেটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি, হঠাৎ সম্মুখে তাকিয়ে দেখি—উদ্যত ছোরাহস্তে গুণ্ডার বেশে বিপদ উপস্থিত। সেদিন সে বিপদ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন ঐ পল্লীর বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ এ এম ও গণি—কৃতজ্ঞচিত্তে আজও তাঁকে স্মরণ করি। এই দাঙ্গায় ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর প্রকাশ্য দিবা-লোকে আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন আমার অতি নিকটআত্মীয় হাইকোর্টের জজ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তাঁর ভাই আশ্চর্যজনকভাবে সপরিবারে রক্ষা পেয়েছিলেন পার্কসার্কাস এলাকায় ঝাউতলা রোডে সম্পূর্ণভাবে মুসলমান পরিবেষ্টিত থেকেও। মুসলমান প্রতিবেশীরাই তাঁদের সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও তাঁর পুত্রবধূ সুজাতা দেবী তাঁদের মুসলমান বাবুর্চিটির প্রাণরক্ষা করেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণকারীদের বাধা দিয়ে। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আর একটি বীরত্বের কাহিনী। রাজাবাজার অঞ্চলে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন মেয়েদের কলেজ—হোস্টেলও একই চত্বরে অবস্থিত। প্রিন্সিপাল লীলা লতিকা রায় হোস্টেলেই থাকেন। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যার কিছু পরে গুণ্ডার দল হোস্টেলে হানা দিল, গুরুতররূপে আহত হল দারোয়ান। গুণ্ডারা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছে, হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্রিন্সিপাল নিজে এবং গুণ্ডাদের সর্দারকে ডেকে বললেন, 'আমি এই আহত লোকটিকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে যাচ্ছি, আবার এখানেই ফিরে আসব, আমার হোস্টেলের মেয়েরা এখানে আছে, তাদের ফেলে রেখে আমি কোথাও পালাব না। এই অসমসাহসিকা ভদ্রমহিলার আচরণ বোধ হয় গুণ্ডাদলের সর্দারকে অভিভূত করেছিল। সে প্রিন্সিপালকে আশ্বাস দিয়েছিল—তারা তো মেয়েদের কোন অনিষ্ট করবেই না, অন্য কোন দল যদি আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তাদের প্রাণপণে বাধা দেবে। গুণ্ডাসর্দার তার কথা রেখেছিল।

শয়তান একবার জাগ্রত হলে তাকে তার অপকর্ম থেকে নিরস্ত করা খুবই দুরূহ। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই হিন্দু ও শিখরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম গুণ্ডাদের অত্যাচারের প্রতিশোধে মেতে উঠল। গুণ্ডারীতি অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডারা নিজেরা নিরাপদে থেকে পৈশাচিক নরহত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজ নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে লাগল। সামরিকবাহিনী নামিয়ে ও কারফিউ জারী করেও যখন বিশেষ সুফল পাওয়া গেল না, প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ৪০নং থিয়েটার রোডের বাড়িতে এক সর্বদল সম্মিলন আহ্বান করলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন, শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, এম এ ইস্পাহানী, মেয়র এস এন উসমান, হামদুল হক চৌধুরী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী আবুল হালিম প্রভৃতি। স্থির হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা খোলা ট্রাকে করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করবেন ও শান্তির আহ্বান জানাবেন। যেদিন হাজরা রোডের মোড়ে একই খোলা ট্রাকে শরৎচন্দ্র বসু ও সুরাবর্দীকে শান্তির বাণী প্রচার করতে দেখেছিলাম, সেদিন আমার মনে অন্ততঃ অবিমিশ্র ঘৃণা ছাড়া আর কোন অনুভূতি হয়নি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সুরাবর্দী। শান্তির বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু মীনা পেশোয়ারীকে মুক্ত করতে ছুটেছিলেন, পার্ক স্ট্রীট থানায় গিয়েছিলেন বারোজন কুখ্যাত গুণ্ডার মুক্তির ব্যবস্থা করতে আর তাঁর একান্ত অনুরক্ত এম. এল. এ. গোলাম সারোয়ারের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন নোয়াখালি ও কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অর্থাৎ হিন্দুনিধনের ব্যবস্থা করতে। পূর্ব ভারতে জিন্নার তিনি দক্ষিণহস্ত, আবার গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অনুরাগও ক্রম-বর্ধমান। অথণ্ড সার্বভৌম বঙ্গদেশের জন্য মিলিত প্রস্তাব এনেছিলেন তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য বহু অনুরোধ তাঁরা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীকে, তবে দুটি সামান্য প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দিতে পারেননি—বাংলার হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতি কি এক এবং অভিন্ন? সার্বভৌম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা কি ভবিষ্যতেও কখনও পাকিস্তানে যোগদান করতে চাইবে না? প্রশ্ন দুটির একটিরও উত্তর পাওয়া না যাওয়ায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

প্রকাশ্যে গণহত্যার নিন্দা করলেও জিন্না উল্লসিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই, শত চেষ্টাতেও তিনি যে দ্বিজাতি তত্ত্ব

প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি—মাত্র কয়েকদিনের গণহত্যায় বাংলা তথা সমগ্র ভারতের হিন্দু-মুসলমান তা স্বীকার করে নিল।

বাংলার এই চরম দুর্দিনে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মভূমি কলকাতা শহর যখন প্রকৃত অর্থেই জ্বলছে, তখন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু কি করছিলেন? ১৭ই আগস্ট তিনি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন! কলকাতা বা নোয়াখালিতে যখন হিন্দুনিধন চলছিল, তখন তাঁর বাংলায় আসার সুযোগ হয়নি—তবে বিহারে দাঙ্গার খবর পাওয়ামাত্র তিনি ছুটে গিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন, "এখনই যদি দাঙ্গা বন্ধ না হয় তা হলে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে তা বন্ধ করা হবে!" দুর্ভাগ্য বাংলার, দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার তখনও পর্যন্ত যাঁদের হাতে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল, সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিজয়ী বীরেরাই বা কি করছিলেন?

দাঙ্গা শুরু হওয়ার নয় দিন পরে ২৫ আগস্ট ভোরবেলায় লর্ড ওয়াভেল কলকাতায় এলেন এবং দেখলেন গুটিকয়েক অগ্নিদগ্ধ অফিস, দোকান ও ঘরবাড়ি ছাড়া দাঙ্গার আর বিশেষ কোন চিহ্নই বর্তমান নেই। সৈন্যদলের কিছু অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন তিনি এবং তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে, সকলেই একমত যে সৈন্যদল খুবই ভাল কাজ করেছে। বেলা ৪টে থেকে ৭-৩০ এই সাড়ে তিন ঘণ্টা তিনি পুলিস কমিশনার হার্ডউইক, সুরাবর্দী, অ্যাকটিং আর্মি কমাণ্ডার বুচার, চীফ সেক্রেটারী ওয়াকার প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন। পরদিন সকালবেলা ওয়াভেল হিন্দু মুসলিম ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তারপর ছোট লাট বারোজের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে দিল্লী রওনা হয়ে যান। সেখানে অনেক জরুরী কাজ ফেলে এসেছেন।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় এই কয়েক ঘণ্টার সফরের সময় বাংলা গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা মিঃ পি এস মাথুরও বড়লাটের সঙ্গে ছিলেন। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর একটি বিবৃতির উল্লেখ করেছেন (বাংলার ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড পৃ ৪১৭), "বড়লাট ওয়াভেল বাংলার লাটকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন, আমরা শুনিয়াছিলাম যে কলিকাতার রাস্তা মৃতদেহে ভর্তি (littered with Corpses)—কিন্তু আমরা তো একটিও দেখিলাম না। বড়লাটের সেক্রেটারী জর্জ এবেল (George Abell) আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিও বলিয়া উঠিলেন, এটা তো ভারী আশ্চর্য নয় কি? আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, এবেলকে বলিলাম, বড়লাট আটদিন পরে আসিয়াছেন—মৃতদেহ সাজাইয়া রাখিবার নোটিশ পাই নাই। কিন্তু তিনি আসার তিন দিন পূর্ব পর্যন্ত আইয়োডিন মাথা মুখোশ পরিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া পাঁচ হাজার আটশত উনসত্তরটি মৃতদেহ আমরা কলিকাতার রাস্তা হইতে সরাইতে সমর্থ হইয়াছি।"

দুঃস্বপ্নের মত আজও মাঝে মাঝে চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে শহরের পথে পথে অগণিত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, শিশুর মৃতদেহ—তাদের অজানা আতঙ্কে বিস্ফারিত নিষ্প্রাণ চক্ষু দুটি তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে—সে কি ভগবানের কাছে বিচার প্রার্থনায়? না, তারা তো আজ আর হিন্দু বা মুসলমান নয়—তারা যে আজ শুধুই শবদেহ, ঈশ্বর বা আল্লার কাছে নয়, তারা বিচারপ্রার্থী একমাত্র বিশ্বমানবের শুভবুদ্ধির কাছে।



এই তো একজন

শৈবাল চক্রবর্তী

সংসারে নির্ভেজাল সুখ বা দুঃখ বলে কিছু আছে কিনা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে যা ধবধবে সাদা, ভেতরে হয়ত তার কাজলের কালিমা। যে লোকটিকে বাইরে থেকে দেখে রুক্ষ এবং কর্কশ স্বভাবের মনে হয়, মেলা-মেশার পর দেখা যায় তার মত ভালমানুষ আর দুটি নেই।

যেমন সুবিমলের একতলার ভাড়াটে মালতী দত্তগুপ্তের মৃত্যু। ঘটনা দুঃখের সন্দেহ নেই, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তা সুবিমলের সৌভাগ্যের সূচনা করে গেল। টানা তিন বছর রোগভোগের পর উনি চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল সত্তর—স্বামী অনুপমের সাত বছর বেশি। একতলায় ওই দুটি প্রাণী বাস করছিলেন সাঁইত্রিশ বছর। মনে হত যেন ওখানেই থাকবেন ওঁরা চিরদিন। ভাড়া পঁচাত্তর থেকে বাড়তে বাড়তে তিনশো পর্যন্ত উঠেছিল। সংসারখরচের চাপে জেরবার সুবিমল মনেপ্রাণে চাইছিল বাড়িটা ওরা ছেড়ে দিক। সে নতুন হারে ভাড়া দিয়ে তার রোজগারটা বাড়িয়ে নিক।

এখন প্রত্যেকেই যখন চাইছে আরও ভালভাবে বাঁচতে, তার মধ্যে সুবিমল লক্ষ্য করত, মালতী-অনুপমরা কেমন সাদামাটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রায় যৌবনের শুরু থেকে এই পরিবারটিকে দেখছে সুবিমল। ওদের জীবনযাত্রার ধরন গোড়ার দিকে যেমন ছিল, পরেও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বয়স হলেও মানুষের শখ-আহ্লাদ শেষ হয়ে যায় না। কিন্তু ওঁরা যেন সে প্রবৃত্তি জয় করেছেন। চলমান স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, এক বর্ণহীন দিনযাপনের নিয়মে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন ওঁরা মহা আনন্দে। টেলিভিসনকে ওঁরা বাহুল্য মনে করেন। একটি মাসিক পত্রিকা ও পুরনো আমলের বড় রেডিওসেট ওঁদের প্রমোদের মাধ্যম। যে ঘরটিতে কাজকর্ম ওঁরা করেন সেটিতেই শুধু আলো জ্বলে, বাকিটা অন্ধকারে রাখা নিয়ম। এই বয়সেও বাজারের থলি নিজে হাতে বয়ে আনেন অনুপম। রিকশা চড়া, কি কাজের লোক দিয়ে বাজার করানো বিলাসিতা ওঁদের কাছে।

মালতীর মৃত্যু সুবিমলের বুকের কোথাও একটু আঁচড় কেটেছিল। বহুদিন ধরে দেখা একটা চেনামুখ, বয়সের সঙ্গে জীর্ণ বিবর্ণ হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল। মহিলা একেবারে দয়াবতী টাইপের ছিলেন না। গম্ভীর, মেপে কথা বলা স্বভাব ছিল। তবু তাঁর মৃত্যু তার কাছে আঘাত, অনুপমের কথা ভেবে আরও বেশি। এই বয়সে একা হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মালতীর অবস্থা গুরুতর হওয়ার সময় থেকেই উনি বলতেন, 'যাওয়ার কথা তো আমার আগে, আর দেখুন জীবনসংশয় হচ্ছে ওর।' কথাগুলো বলার সময় ওঁর দন্তহীন মুখে একটা সরল হাসি ফুটত—যা দেখে কষ্ট পেত সুবিমল আরও বেশি।

শোকের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যেতে আর কদিন লাগে! জীবন তারপর ফিরে যায় নিজের নিয়মে। আত্মীয়স্বজন যাঁরা এসেছিলেন শেষ কাজে, তাঁরা একে একে ফিরে যান যে যাঁর জায়গায়। সুবিমলও ঠাণ্ডামাথায় অবস্থাটা খতিয়ে দেখার সুযোগ পায়। দীপিকার সঙ্গে কথা বলে সে বুঝেছে, এখনই বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন না অনুপম। সংসার মাত্র দুজনের এবং বাহুল্যবর্জিত হলেও চল্লিশ বছরে জিনিসপত্র কম জমা হয়নি। এসব নিয়ে কোথায় উঠবেন তিনি? এ অবস্থায় এখনই এ বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

এতে সুবিমল বিচলিত হয় না। সে পোড়খাওয়া মানুষ। অনেক কষ্টে দোতলা বাড়িটা দাঁড় করিয়েছে। ছেলেকে মানুষ করেছে, মেয়ের বিয়ে যা বাকি। সাতাত্তর—সে অনায়াসে আরও তিন বছর অপেক্ষা করতে রাজি! আশিই এখন গড়পড়তা মানুষের আয়ুর সীমানা। তারপর তো সে বাড়িটা পেয়েই যাচ্ছে। ভাবনা ছিল মহিলাকে নিয়ে, তাঁর বয়স কম—আগে চলে গিয়ে তিনি সে সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। এতদিন কম ভাড়া পাওয়ার লোকসানটা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ যে তার হাতের মুঠোয়

তাতে সন্দেহ কি!

উল্লাসটা এমন তীব্রভাবে অনুভব করে সুবিমল যে, অন্তরঙ্গ মানুষদের খবরটা না জানিয়ে সে পারে না। কেউ কেউ তার অস্বাভাবিক কম ভাড়া নেওয়ার ব্যাপার নিয়ে উপহাস করত তাকে—'এখনকার দিনে রাস্তার ধারে বাড়ি, তিনখানা ঘর, তিনশো টাকা ভাড়া, তুমি সহ্য করো কি করে?' কেউ কেউ পরামর্শ দিত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে। এসবের জবাবে এখন হাসিমুখে তিনটি আঙুল তুলে দেখায় সুবিমল। ইঙ্গিতটি দুদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তিন বছর বাকি তার অবসর নেওয়ার, আর ভাড়াটের পরমায়ুও ততদিনের। তারপরেই ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারবে সে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য সঞ্চয় প্রকল্পে আশানুরূপ টাকা না জমা হওয়ার খেদও সে এইবার পুষিয়ে নিতে পারবে। নিকটজনের কাছে সুবিমল বলেছে, ভাড়া দুই কি আড়াই যাই হোক—আগাম পঞ্চাশ হাজার না নিয়ে সে ভাড়াটে বসাবে না একতলায়।

অকস্মাৎ এক ঝলক টাটকা বাতাসে যেন সুবিমলের ঘরের গুমোট কেটে যেতে যায়। প্রথমে দীপিকার মুখে শোনা, পরে অনুপম তাকে ডেকে পাঠিয়ে জানান—'সামনের মাসের পয়লা তিনি একতলা খালি করে দিচ্ছেন। ভেবেছিলেন যে কদিন বাঁচবেন এখানেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারছেন এখানে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাড়ির সর্বত্র মৃত মানুষটির চিহ্ন ছড়ানো, প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ছে তাকে। একমাসও যায়নি, এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি যেন।' অনুপম বলছিলেন তাঁর ঘরে বসে। দীপিকাও ছিল সেখানে—'ওরই সাজানো সংসার, অথচ ও নেই। অসুখে পড়ার পরে দিনরাত কাছে থাকতে হত তো। সন্তান নেই। আত্মীয়স্বজনেরাও দূরে, তাই আমাকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরত শেষদিকে।...এখনও যেন মনে হয়, পাশের ঘর থেকে ডেকে জল দিতে বলল বা জানতে চাইল কটা বেজেছে।...অসম্ভব, এভাবে থাকা যায় না।'

অনুপমের ছোট ভাই নিরুপম গড়পারে থাকেন। আগে এই বাসাতেই থাকতেন দু ভাই। যুদ্ধের পর কলকাতা শহর যখন খাঁ খাঁ করছে, তখন পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়ায় এই বাড়ি নিয়েছিলেন অনুপম। ওঁদের মা তখন বেঁচে। বিয়ের পর মালতী যৌথ সংসারে থাকা নিয়ে আপত্তি করে। তখনই অনুপম চলে এসেছিলেন কসবায় সুবিমলের বাড়ি। সে সময় বাড়ি করার জন্যে লোনের দরুন প্রতি মাসে একটা মোটা টাকা কাটা হচ্ছে সুবিমলের মাইনে থেকে। ভাড়াটে বসানোর খুব দরকার ছিল তাঁর। সে হয়ে গেল আজ কতদিন। এর মধ্যে কয়েকবার তিনি অনুপমকে বাড়ি ছাড়ার কথা বলেছেন। অনুপম নানা অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছেন তা। বিশ-পঁচিশ টাকা ভাড়া বাড়িয়েছেন তাঁকে খুশি করতে। শেষদিকে সুবিমল যখন খুব বেশি চেপে ধরত তখন ওপর দিকে আঙুল তুলে বলতেন, আর কদিনই বা! ওপারে যাব যখন ছেড়ে দেব আপনার বাড়ি। শুনে গা জ্বালা করত সুবিমলের।

এতদিন পরে ও-বাড়িতে থাকতে অসুবিধে হবে না আপনার? দীপিকা জানতে চায়, তখন একরকম ছিলেন, এখন অন্যরকম।

অসুবিধের কি আছে? উনি দন্তহীন মুখে হাসেন, ও বাড়িতে তো থেকেছি আমি। তিনতলায় সুন্দর বারান্দা, বসে থাকলে রাস্তার দৃশ্য দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়। তারপর ভাইপো আছে, ভাইয়ের বৌ রয়েছে।...গল্প করে দিব্যি সময় কেটে যাবে। বলতে পারো, আগে একজন ছিল—যে এখন নেই, তা সে সমস্যা তো এখানে থাকলে আরও বেশি...এ বাড়ি তো এখন আমার কাছে জেলখানার সমান...।

উনি কথা বলে যান, সুবিমল টের পান তাঁর বুকের ভেতর খুশির কুলকুল নদী বয়ে যায় যেন। তিনি তিন বছর অপেক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন, সেখানে যে আকাশের চাঁদ এত তাড়াতাড়ি হাতে এসে যাবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

এখন এদিক থেকে নদীর ওপারটা দেখতে চেষ্টা করেন তিনি। তিনি তাঁর বাড়িতে আছেন অনুপম সাঁইত্রিশ বছর। তারও বেশ কয়েক বছর আগে গড়পারের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ওঁরা। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। কলকাতার পথে চলতে তখন 'টু লেট' বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ত। ও বাড়ির ভাড়া এখনও নিশ্চয় অবিশ্বাস্য রকমের কম। তিনি তো অব্যাহতি পেলেন এতদিন অপেক্ষার পর, কিন্তু বাড়িওয়ালার মনের অবস্থা কি? নিরুপমের যা অবস্থা শুনেছে, তাতে কোনদিন উনি বাড়ি করবেন বলে মনে হয় না। এখন আবার জুটছেন গিয়ে

অনুপম। অচেনা সেই ভদ্রলোককে নিজের পাশে দাঁড় করাতে চান সুবিমল।

এমনই যোগাযোগ যে, এর কদিন পরে কিরণ সরকারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় সুবিমলের। অনুপমই পীড়াপীড়ি করে সঙ্গে নিয়ে যান তাঁকে—কোথায় যাচ্ছি একবার দেখে আসবেন না? চলুন আমার সঙ্গে। পরে তো যাবেনই, প্রথমবার যাওয়াটা আমার সঙ্গে হোক।

সেই সময়টা সুবিমলের মানসিক অবস্থাটা এমনই ভাল যে তখন তাঁর কাছে যে যা চাইবে তিনি তা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত। দালালদের হাঁটাহাঁটি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং একজন তাঁকে ভরসা দিয়েছে যে আড়াই হাজার ভাড়া সে খুব সহজেই পাবে—সেইসঙ্গে ষাট হাজার আগাম। তাই অনুপম একবার এ প্রস্তাব করতেই রাজি হয়ে যান তিনি। বাড়িটা দেখার একটা কৌতূহলও ছিল তাঁর। নিরুপম-বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মালতীর শেষকৃত্যের সময়। অনুপমের মত ছোটখাট চেহারার মানুষ নন, ভদ্রলোক বেশ লম্বা, পোশাকপরিচ্ছদেও কিছু সৌখীন। বাড়িটা অন্তত একশো বছরের পুরনো, কিন্তু বনেদিয়ানার ছাপ সর্বত্র। চকচকে লাল মেজে, উঁচু ছাদ, চওড়া বারান্দায় মজবুত লোহার রেলিং। ওরা সেই বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন, অনুপম মহা উৎসাহে কথা বলে যাচ্ছেন। এই বাড়িতে প্রথম যখন আসেন চট্টগ্রামে বোমা পড়ার সময়, মা এবং ছোট ভাইকে নিয়ে, সেই সময়কার বহু ঘটনা মনে পড়ছে তাঁর। তখন জীবন মন্থর ছিল, সকালগুলো ছিল ঝলমলে, প্রতিটি সন্ধ্যা ছিল সেতারের সুরে বাঁধা। নিরুপম খেই ধরিয়ে দিতে অনুপম আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। ওঁদের মায়ের কথা আসে ফিরে ফিরে। বলতে বলতে যেন ঘোর লেগে যায় ভদ্রলোকের।

ঠিক এই সময় কিরণবাবুর আগমন। সুবিমল তাঁকেই দেখবে বলে উচ্চকিত হয়ে ছিলেন। ইলেকট্রিক বিলের ব্যাপারে তাঁর নিরুপমবাবুর সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বোধহয় একটা মিটার দুজন ভাড়াটের নামে, তাই বিল আসার পরে টাকাটা ভাগাভাগি করে দিতে হয়। ওঁকেও চা দেয় সুভদ্রা। নিজের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভদ্রলোককে আড়চোখে লক্ষ্য করেন সুবিমল। পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছর বয়স হবে। রং কালোর দিকে, গড়ন ছোটখাট, মাথায় টাক। পরনে বাড়িতে কাচা ধুতি, ফতুয়া। সব সময় খুব তটস্থ ভাব। যেন বললেই এখুনি এক মাইল ছুটে আসতে পারেন। চা-টা শেষ করেন চোখের নিমেষে। আর কার সঙ্গে যেন দেখা করার কথা—তাই বসবার সময় নেই।

বিদায় নেওয়ার সময় ওঁকে একটু একান্তে পেয়ে যান সুবিমল। এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তিনি। যোগাযোগটা হয়ে যায় হঠাৎ। চা-পর্ব সেরে এবং সামনের রবিবার আসা সাব্যস্ত করে অনুপম বেরিয়ে এসেছিলেন। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে ডাক আসে তাঁর। সুভদ্রা একটি ছোট টেবিল দেখিয়ে জানতে চেয়েছিল এই টেবিলে তাঁর হবে কিনা। অনুপমবাবুর আবার ডায়েরী লেখার অভ্যেস আছে। তিনি ভেতরে যাওয়ামাত্র দরজার বাইরে কেবল দুজন—সুবিমল ও কিরণ সরকার। সুবিমল দেখেন এই সুযোগ। কিরণের কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করেন তিনি আপনার এ বাড়ির পুরোটাই বুঝি ভাড়া?

কিরণবাবু পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করেছিলেন, তাতে টোকা দিয়ে জবাব দেন, দোতলাটা বাদে। ওটাতে আমি থাকি। এমনি আরও দুটো বাড়ি আছে আমাদের এ পাড়ায়। তখনকার দিনে সস্তায় বাড়ি হয়ে যেত বলে কর্তারা মনের সুখে বাড়ি বানাতেন আর ভাড়া দিতেন। নস্যিটা নাকে দিয়ে শব্দ করে হেসে ওঠেন তিনি।

সবই কি পুরনো ভাড়াটে? সুবিমল চাপা গলায় প্রশ্ন করেন।

সব। এত সস্তায় বাসা পেলে কে আর ছাড়তে চায় বলুন! এই সার্বজনীন সত্যটা বলার সময় তাঁর গলার স্বরে কোন ক্ষোভ প্রকাশ পায় কিনা সুবিমল তা লক্ষ্য করে।

আমার তো মশাই রাহুমুক্তি হল, ওঁকে একটু উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন সুবিমল, সাঁইত্রিশ বছর ছিলেন ভদ্রলোক। তিনশো টাকার মত দিতেন শেষদিকে। নেহাৎ স্ত্রী মারা গেলেন তাই…নইলে কোনদিন ওই একতলা আমি ফিরে পেতাম এমন ভরসা ছিল না! এখন ওই ফ্ল্যাট একটু সারিয়ে-সুরিয়ে দিলে দেড় দু হাজার তো হেসেখেলে—

আপনি যা বললেন তার চেয়ে আমি কম পাই, অনেক কম। কিরণবাবুকে এখন গল্পে জমাতে পেরেছেন বুঝে খুশি হন

সুবিমল, নিরুবাবু একশো দিতেন, ভাই আসছেন বলে পঁচিশ বাড়াবেন বলেছেন—বাস এই ! নিশ্চয় ওটাও এখনকার রেটের তুলনায় অনেক কম—তিনখানা ঘর, দুটো বারান্দা। সে যাই হোক মশাই, দু ভাই যে একসঙ্গে থাকবেন এতদিন বাদে এই ভেবে আমার ভাল লাগছে। কতদিন আগে এখানে ছিলেন দুজন, ওঁদের মা তখনও বেঁচে। দুজনেই যুবক বলতে গেলে। আমারও তখন বয়স অনেক কম। আমি ওঁদের সেই জোয়ান বয়সটা দেখেছি—দেখেছি মায়ের শাসন, আদর। তারপর বউরা এল—সব এখানে। এতদিন বাদে, আমার বাড়িতে ফের দু ভাই যে একসঙ্গে থাকবেন এটা কি কম সুখের কথা, বলুন আপনি !

সুবিমল মন দিয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ কিরণবাবু চুপ করে যেতে যেন কোথায় একটা তার ছিঁড়ে যায়। ওদিকে অনুপমবাবু বেরিয়ে এসেছেন, তাঁকে দেখতে পেয়েই থেমে গিয়েছেন কিরণবাবু।—চলুন, চলুন সুবিমলবাবু। ওদের কাছে এসে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গীতে বলেছেন অনুপম, একটু দেরিই হয়ে গেল। এবার রওনা দেওয়া যাক, চলুন।

কিরণবাবুর তো তাড়া ছিলই হাত তুলে বিদায় জানানোর ভঙ্গীতে তিনি বলেন, তাহলে ওই পয়লাই আসছেন তো অনুপমবাবু? দেখা হবে···

পা চালিয়ে চলে যান তিনি। সুবিমল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। অনুপমবাবু দু'পা এগিয়ে গিয়ে যে তাঁকে ডাকাডাকি করছেন তা যেন শুনেও শোনেন না তিনি। তাকিয়ে দেখছেন কিরণ সরকার ক্রমশ রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। ঠিক তা নয়, যত দূরে যাচ্ছেন তত যেন এগিয়ে আসছেন।··· এতদিন ভাগ্যবান বলে তিনি নিজেকে অন্যদের থেকে একটু আলাপ করে দেখতেন। কিন্তু এখন মনে হয় এমনও কেউ কেউ আছে যারা সুখে থাকে অন্যেরা আনন্দে রয়েছে বলে।

অজানা ব্যথা

উমা সরকার

একদিন সব ফেলে যাব চলে,
এই আকাশ এই বাতাস থাকবে কি
আগের মত।
সন্ধ্যায় পাখিরা কি ফিরে যাবে নীড়ে
গোধূলিতে রাখাল ছেলে গাভী নিয়ে
যাবে কি ঘরে।
সবুজ হাওয়ার ঢেউ খেলে যাবে কি
সোনালি ধানের ক্ষেতে।
বৈশাখের ধুলো-রঙা মেঘ যেতে যেতে থমকে যাবে কি
আমার চালাটির কাছে।
শ্রাবণের বাদল-ধারায় অবগাহন করবে কি
আমার আঙ্গিনা।
শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ থাকবে কি চেয়ে
আমার শিউলির বাগানে।
ঘুঘু-ডাকা বিষণ্ণ দুপুর দাঁড়াবে কি
আমার জানালার কাছে।
ধবল কপোতের ঝাঁক বসবে কি
আমার দাওয়ায়।
এরা খুঁজবে কি আমায়!

উৎসর্গপত্র ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নরেশচন্দ্র জানা

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে জানলে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় তাঁর প্রথম উপন্যাসকুসুমটি জ্যেষ্ঠাগ্রজের শ্রীচরণে কখনো অঞ্জলি দিতেন না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র উৎসর্গপত্র এরূপ ছিল—'জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণে এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাম।'

দুর্গেশনন্দিনী বার হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালে যেমন অজস্র খ্যাতি-প্রশংসা জুটেছিল, তেমনি ঢের নিন্দা-ভর্ৎসনাও জুটেছিল। দুর্গেশনন্দিনীকে নব্যপন্থী পাঠকেরা যে বিপুল সমাদর জানিয়েছিলেন তা রমেশচন্দ্র দত্তের জবানীতে জানা যায়—'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে।' উপন্যাসটিকে প্রাচীন-পন্থীরা যে কঠোর নিন্দা করেছিলেন তার নজির মেলে। নিন্দার কারণ আর কিছু নয়, দুর্গেশনন্দিনী বড়ই অশ্লীল রচনা। এঁদের মতে বিয়ের আগে কুমারীর প্রেমের বর্ণনা অশ্লীলতার চূড়ান্ত। 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক লিখলেন—'দেখুন সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অশ্লীল গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই।' উৎসর্গপত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের বড়দাদার প্রতি প্রীতির পরিচয়বহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা 'ললিতা ঃ পুরাকালিক গল্প, তথা মানস' বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রাবস্থাতেই লেখা ও ছাপা হয়েছিল। সাহিত্যসাধনার প্রথম ফসল বঙ্কিমচন্দ্র কাউকেই উৎসর্গীকৃত করেননি। কবিতা ও প্রবন্ধ পুস্তকের বাইরে বঙ্কিমচন্দ্র মোট চোদ্দখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' উৎসর্গ করেছিলেন মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল—মদগ্রজ শ্রীযুক্তবাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই গ্রন্থ উপহার প্রদান করিলাম।

বড়দাদার পরেই মেজদাদার স্থান বলেই প্রথম উপন্যাসের পর দ্বিতীয় উপন্যাসটি তাঁকে উৎসর্গ করে থাকবেন। এছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল মালুম হয়। কপালকুণ্ডলা রচনার সূচনায় একদিন কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রকে প্রশ্ন করেন—যদি শিশুকাল থেকে ষোলো বৎসর পর্যন্ত কোনো স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিত হয়, অন্য কারও মুখ দেখতে না পায়, সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেউ বিয়ে করে সমাজে নিয়ে আসে, তবে সমাজসংস্পর্শে তার কতদূর পরিবর্তন হতে পারে ও তার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হবে? দীনবন্ধু জবাবে কিছু বলেননি। পাশে ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র। প্রথমে ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'দরিদ্র ঘরে বিয়ে হলে চুরি করে খাবে, পরবে।' পরে ব্যঙ্গ ছেড়ে বলেছিলেন—'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে, স্বামিপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, তাহার মন হইতে সন্ন্যাসীর প্রভাব একেবারে তিরোহিত হইবে।' কপালকুণ্ডলা সঞ্জীবচন্দ্রকে উৎসর্গ করে তাঁর প্রতিপাদ্য যে যথার্থ নয় তা জানাতে চেয়েছিলেন এমনটি হতে পারে। সঞ্জীবচন্দ্রের উৎসর্গপত্রে 'শ্রীচরণ'-এর উল্লেখ নেই। এ থেকে বোঝা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র বড় ভাই হলেও তাঁর বন্ধুতুল্য ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। সেই সৌহার্দ্যসূত্রেই তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' দীনবন্ধুকে উৎসর্গ করেছিলেন বলা যায়। মৃণালিনীর উৎসর্গপত্র এরূপ ছিল—বঙ্গকবিকুলতিলক শ্রীযুক্তবাবু দীনবন্ধু মিত্র সুহৃৎ-প্রধানকে এই গ্রন্থ প্রণয়োপহারস্বরূপ উৎসর্গ করিলাম।

দীনবন্ধু প্রসিদ্ধ নাট্যকার হিসেবে পরিজ্ঞাত। উৎসর্গপত্রে তাঁকে 'বঙ্গকবিকুলতিলক' বলা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হতে

পারে। দীনবন্ধুর সাহিত্যসাধনার আদিপর্বের দিকে তাকালে তাঁকে এই বিশেষণে বিশেষিত করার কারণ মিলবে। নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে দীনবন্ধু কাব্যচর্চা করতেন। দীনবন্ধুর কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রকে খুবই মুগ্ধ করত। 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মানবচরিত্র' নামে দীনবন্ধুর একটি কবিতার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি।' দীনবন্ধুকে 'বঙ্গকবিকুল-তিলক' হিসেবে আখ্যাত করার মূলে এই কবিত্বমুগ্ধতা কাজ করেছে মালুম হয়।

মৃণালিনীর পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত পঞ্চম রচনা ও চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। বঙ্কিমচন্দ্র এটি উৎসর্গ করেন জগদীশনাথ রায়কে। উৎসর্গপত্র এরূপ ছিল—

কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্তবাবু জগদীশনাথ রায় সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।

জগদীশনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয় তমলুকে ঘটে। জগদীশনাথ সেখানে পুলিসের সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন। পুলিসে চাকুরি করলেও লেখালেখির ঝোঁক ছিল। বঙ্গদর্শনে তাঁর লেখা বঙ্কিমচন্দ্র বার করেছিলেন। জগদীশনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে পনের বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু সম-বয়স্কের মতো তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল। কারো কারো ধারণা, বিষবৃক্ষ উপন্যাসের 'হরনাথ ঘোষাল' চরিত্রটি জগদীশনাথ রায়ের আদলে তৈরি। 'অনেকেই হয়তো জানেন না যে, এই জগদীশবাবুই বিষবৃক্ষের হরদেব ঘোষাল কল্পিত হইয়াছিল।'

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিমজীবনী'-তে লিখেছেন, 'হরদেব ঘোষালের পত্র দুইখানি শুনিতে পাই স্বর্গীয় জগদীশ-নাথ রায় কর্তৃক লিখিত। এ হেন সুহৃদ্জনকে বিষবৃক্ষ উপন্যাসখানি উৎসর্গ করা সঙ্গত বটে।'

বিষবৃক্ষের পরে প্রকাশিত হয় 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'লোকরহস্য'। বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি বই কাউকেই উৎসর্গ করেননি। এরপর বিখ্যাত 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি তিনি অনুজ পূর্ণচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল –

অনুজ শ্রীমান বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থ স্নেহচিহ্নস্বরূপ উপহার প্রদত্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের কাছে প্রায়ই বাংলার ইতিহাসের গল্প শুনতেন। ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসটি তাই বোধ হয় ছোট ভাইকে উৎসর্গ করে থাকবেন। চন্দ্রশেখরের পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অপূর্ব রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর' রামদাস সেনকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল—

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্তবাবু রামদাস সেন মহাশয়কে এই গ্রন্থ প্রণয়োপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।

উনিশ শতকে পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে যে কজন খ্যাত হন, রামদাস সেন তাঁদের একজন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে রামদাসের লেখা খুব পছন্দ করতেন এবং তাঁরই অনুরোধে রামদাস একটার পর একটা করে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতসমাজে খুবই আদৃত হয়েছিল। ইটালির ফ্লোরেনটিনো অকাডেমি তাঁকে দিয়েছিল 'ডক্টর' উপাধি। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের লেখককে কমলাকান্তের দপ্তর উৎসর্গ করে হয়তো তাঁর মনকে লঘুভার করে তুলতে চেয়েছিলেন। পর পর প্রকাশিত চন্দ্রশেখর ও কমলাকান্তের দপ্তর বই দুখানি উৎসর্গ করার পর দীর্ঘকাল তাঁর কোনো রচনা আর কাউকে উৎসর্গ করেননি। কমলাকান্তের দপ্তর-এর বিনা উৎসর্গপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল 'বিবিধ সমালোচনা', 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী', 'রজনী', 'উপকথা', 'কবিতা-পুস্তক', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'সাম্য', 'প্রবন্ধ পুস্তক' ও 'রাজসিংহ'। এ সবের পর প্রকাশিত 'আনন্দমঠ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র আবার উৎসর্গপত্র জুড়লেন। কিন্তু বইটি কার উদ্দেশ্যে যে উৎসর্গীকৃত তা বলা কঠিন। লক্ষণীয় যে চিরাচরিত উৎসর্গপত্রের রীতি এখানে অনুসৃত হয়নি। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল— উৎসর্গপত্র

ক ণু মাং ত্বদধনজীবিতং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সব লেখার প্রায়ই পরিমার্জনা করতেন। আনন্দমঠের প্রতি সংস্করণে কমবেশি কিছু না কিছু অদলবদল

করেছিলেন। কিন্তু উৎসর্গপত্রেরও অদলবদল করেছেন এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের পরে 'উৎসর্গপত্র' থেকে 'পত্র' শব্দটি তুলে দেন এবং এইরূপ উৎসর্গ হইল—'এর জায়গায়' এরূপ উৎসর্গ হইল লেখেন। সংস্কৃত শ্লোকটি কালিদাসের প্রখ্যাত মহাকাব্য কুমারসম্ভব'-এর চতুর্থ সর্গ থেকে নেওয়া। মহাদেবের রোষনেত্রে মদন পুড়ে ছাই হলে রতি যে বিলাপ করেছিলেন, এটি সেই রতি-বিলাপেরই অংশবিশেষ। শ্লোকটির সরল মানে এই—'জলের তোড় যেমন বাঁধ ভেঙে জলের পদ্মকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ক্ষণমাত্রেই আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বকে ছিন্ন করে এবং আমাকে ব্যথিত করে তুমি কোথায় গেলে ? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ কাকে উৎসর্গ করেছিলেন, সংস্কৃত শ্লোকটি থেকে বোঝা মুস্কিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ—তৃতীয় প্রস্তাব'-এ লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বড় মেয়ে শরৎকুমারীর একটি শিশুপুত্রের মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ে ঐভাবে লিখে তাকেই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। অপর দিকে দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতকুমার মিত্র তাঁর 'বঙ্কিমবাবু' প্রবন্ধে লিখেছেন—'আমার পিতৃদেব তাঁহাকে (বঙ্কিমচন্দ্রকে) 'নবীন তপস্বিনী' নাটক উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহাকে 'মৃণালিনী' উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে বন্ধুর জীবনের সহিত শেষ হয় নাই, তাহা দেখাইবার জন্য আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে' (অগ্রহায়ণ, বৈশাখ ১৩২২)।

বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক বই একই ব্যক্তিকে উৎসর্গ করেননি দেখা যাচ্ছে। দীনবন্ধুর অকালমৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর যেদিন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাড়ি যান, সেদিন তিনি দীনবন্ধুর এক শিশুকন্যাকে 'ক্রোড়ে করিয়া শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন।' এই শোকাবেগ থেকে একখানি বই আগে উৎসর্গ করলেও অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে আর একখানি বই উৎসর্গ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা খটকা এই যে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৭৩ সনের ১লা নভেম্বর আর আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ সনের ১৫ই ডিসেম্বরে। এতদিন পরে বন্ধুর অকালবিয়োগের স্মৃতিতে শোকাতুর হয়ে একখানি বই উৎসর্গ করতে চেয়েছেন এমন ভাবা শক্ত। বরং আনন্দমঠ প্রকাশের কিছু আগে শিশু দৌহিত্রের অকালমৃত্যুতে কাতর হয়ে তারই উদ্দেশে বইখানি উৎসর্গ করা সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় আনন্দমঠের পরে গ্রন্থাকারে আরো দশখানি উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা ধরনের বই বার হয়। এর মধ্যে মাত্র দুটি বইতে উৎসর্গপত্র ছিল। দুটিই উপন্যাস—একটি 'দেবী চৌধুরাণী' ও অপরটি 'সীতারাম'। একালের লেখকেরা প্রায়ই তাঁদের প্রথম জীবনের লেখা বাবা কিংবা মাকে উৎসর্গ করে থাকেন, দেখা যায়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তা করেননি। একেবারে লেখকজীবনের শেষপর্বে পৌছে তিনি তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' স্বর্গত পিতা যাদবচন্দ্রের পাদপদ্মে নিবেদন করেন। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল—

যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন, যিনি এখন পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়, তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

উৎসর্গপত্রে কারোর নাম না থাকলেও এটি যে পিতা যাদবচন্দ্রেরই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত তা অনায়াসে আন্দাজ করা চলে। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্বকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। উৎসর্গপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, পিতার কাছেই বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কাম ধর্মের পাঠ পেয়েছিলেন, সুতরাং সেদিক থেকে বাবাকে এই বইখানি উৎসর্গ করা সর্বতোভাবে সার্থক। তাছাড়া পিতৃভক্তির যে আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র মনে পোষণ করতেন, তা তাঁর এই উপন্যাসের নায়ক ব্রজেশ্বরের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীতে লিখেছেন—'ব্রজ নীরব ; বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কইত না—এখন যত বড় মূর্খ, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে'। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সেকালের সেই হীরার ধার যুবকপুত্র হয়েও বাবার কাছে চুপ করে থাকতেন। বাবার সব হুকুম মান্য মনে করতেন। জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম চাকুরিস্থলে যাবার কালে শিশিতে করে বাবার পাদোদক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এহেন পিতৃভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র এত দেরিতে বাবাকে বই উৎসর্গ করলেন কেন? মালুম হয়, দুর্গেশনন্দিনীর উৎসর্গপত্রের বিরূপ সমালোচনা দেখে দেবী চৌধুরাণীর পূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে নরনারীর নানারূপ প্রেমের ছবি থাকায়

বাবাকে সেসব বই উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয়ে থাকবেন। সে যাই হোক, বাবাকে বই উৎসর্গ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাকে কিন্তু কোনো বই উৎসর্গ করেননি। মায়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র কি শ্রদ্ধালু ছিলেন না? বঙ্কিমচন্দ্রের জবান থেকে সেরকম একটা ধারণা হয় অবিশ্যি। 'কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি। নীতিশিক্ষা কখনো হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না' (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ)। এ কারণেই কি বঙ্কিমসাহিত্যে উন্নত মাতৃচরিত্রের অভাব, যদিও নারীচরিত্র অঢেল!

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ ফসলটি (সীতারাম) নিবেদন করেছিলেন তাঁর অশেষ স্নেহের পাত্র অকালে স্বর্গত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল—

সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র উৎসর্গপত্রে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে যেসব বিশেষণে ভূষিত করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট যে তিনি তাঁকে খুব স্নেহ এবং বয়সে ছোট হলেও শ্রদ্ধা করতেন। এ স্নেহ ও শ্রদ্ধা রাজকৃষ্ণের গুণের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বলেছিলেন—'আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া কারও লেখা ভাল করে না দেখে প্রেসে দিইনি। রাজকৃষ্ণ বড় সুন্দর বাঙ্গালা লিখতেন।' বঙ্গদর্শনে প্রথম বর্ষ থেকেই রাজকৃষ্ণ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। তবে প্রাবন্ধিক হিসেবেই খ্যাতি বেশি। কবি বিদ্যাপতিকে বাঙালী হিসেবে উনিশ শতকের শিক্ষিতেরা জানতেন কিন্তু রাজকৃষ্ণই সর্বপ্রথম তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বিদ্যাপতি যে মিথিলার লোক, তা প্রমাণ করেন। রাজকৃষ্ণের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এটির সমালোচনায় লিখেছিলেন—'রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মিষ্টি।' এ থেকেই বোঝা যায়, রাজকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কতখানি শ্রদ্ধা ছিল। রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, আর সীতারাম বই আকারে বার হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাজকৃষ্ণের বিয়োগব্যথাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এই বইটি উৎসর্গ করতে প্রাণিত করেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। রাজকৃষ্ণের মতো বঙ্গদর্শনে আরো যাঁরা লিখতেন, তাঁদের মধ্যে আরো দুজনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। একজন অক্ষয়কুমার সরকার, অপরজন চন্দ্রনাথ বসু। অক্ষয়কুমার সরকারের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র জগদীশনাথ রায়কে লিখেছিলেন—'A young man whom you don't know, but whose intellectual life, I think, I have greatly influenced for good or for evil, and whose inherent gifts presage smething great for him in future. His name is Akshay Sarkar.' যাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এতো উচ্ছ্বসিত, তাঁকে প্রীতিচিহ্ন স্বরূপ একখানিও বই উৎসর্গ করলেন না কেন বলা কঠিন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকেও কোনো বই উৎসর্গ করলেন না কেন, তা ভাববার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর প্রভাব খুবই গভীর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন—'আমার জীবনে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সেসব বলিতে পারিলে, অনেক কাজ হয়। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।' নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকালে তাঁকে কিছু পড়ে শোনাতে অনুরোধ করেন। কি পড়বেন—বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের শেখানো মতো—আমি বলিলাম—বিষবৃক্ষ। তিনি—কোন্ স্থান পড়িব। আমি—যে স্থান আপনার অভিরুচি। তিনি বিষবৃক্ষ খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে

পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি। আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিস্ট' করিয়াছে। রূপবতী, বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী পত্নীর স্নেহমমতামেদুর সান্নিধ্য নিবিড় করে বঙ্কিমচন্দ্র না পেলে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি এমন রঙে-রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক স্থলে জানিয়েছেন—'চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণীস্বরূপা।' স্ত্রীর সম্পর্কে এরূপ মনোভাব সত্ত্বেও একখানিও বই উৎসর্গ করলেন না এ বড়ো বিস্ময়ের কথা। স্ত্রীকে বই উৎসর্গ করলে স্ত্রীপরবশ বলে পাছে কেউ নিন্দামন্দ করে এই ভয়েই কি তা করেননি! দুর্গেশনন্দিনী দাদাকে উৎসর্গের জন্য যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ তিরস্কার ভৎর্সনা বঙ্কিমচন্দ্রকে সইতে হয়েছিল, তা থেকে এমনটি মনে হয়। এ ব্যাপারে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

মুক্তি

অমলেন্দু মিত্র

দরজার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামে ছেলে যতীশ। তারপর দ্রুতপায়ে ভিতরে চলে যায়। অনিরুদ্ধ প্রাতঃভ্রমণে বেরুবার উদ্যোগ করছিলেন। গেলেন না। বসে পড়লেন চেয়ারটায়। কোথাও যদি যাচ্ছে ছেলে বৌরা, তাহলে চাবিটাবি রাখার সমস্যা আছে। কোথায় বা যাবে! কে জানে! ওদের মতিগতি বোঝা দায়। চাকরিটা পাবার পর থেকে একটু একটু কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। স্টীল প্ল্যান্টে চাকরি। তাও এমন কিছু নয়। সাধারণ। অথচ অনিরুদ্ধ চেয়েছিলেন, ছেলে অসাধারণ কিছু হোক। অসাধারণ কিছু হলে হয়ত আরও বদলে যেত। বিয়ের পর কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে ছেলে। বৌ না হয় পরের মেয়ে। বরের বাপকে বাপ বলে মানতে অসুবিধা বোধ করে। যদিও অনেক দেখে শুনে বাজিয়ে, বংশ, কুল, দেখে কনে পছন্দ করেছিলেন। আজ বুঝছেন, ওসবের কোন দামই নেই। জেনারেশন-গ্যাপ কিছুতেই পূর্ণ হয় না।

অনেকগুলো পায়ের শব্দ কানে যেতেই চিন্তার খেই ছিঁড়ে গেল। প্রথমেই নেমে এলো চার বছরের দাদুভাই। ছুটে এসে চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে বললে, দাদু আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।

ঃ তাই নাকি! কোথায় দাদু?

ঃ সাউথে, দাদু।

মুখের কথা মুখেই থাকল। বৌমা ছুটে এসে এক হ্যাঁচকা টানে দাদুভাইয়ের মুখটা ঘুরিয়ে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিল, বাঁদর ছেলে! চল!

বাকরুদ্ধ হয়ে বোকার মত তাকিয়ে রইলেন অনিরুদ্ধ। ছেলে যতীশও নেমে এসেছিল। হাতে প্রকাণ্ড দুটো স্যুটকেস। তার চোখের সামনেই ব্যাপারটা ঘটল। অথচ সে কিছুই বলল না। গট গট করে সটান নেমে গেল। বাপকে প্রণাম পর্যন্ত করলে না। গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলেন। তারপর গাড়ি স্টার্ট করে বেরিয়ে গেল। অপমান, লজ্জা, ক্ষোভে কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সকালে উঠে চা পর্যন্ত বৌমা দিয়ে গেল না। নিজেরা খেয়েছে—কাপ প্লেটের আওয়াজ পাচ্ছিলেন শুয়ে শুয়েই। দোতলার চাবিটা বাইরে গেলে রেখে যায়। আজ রাখল না। নাতিটা কি দোষ করল আজ! অকারণেই মার খেল তাঁর সঙ্গে কথা বলার অপরাধে। এই নাতিকে তাঁর জিম্মায় রেখেই তো ওরা দুজনে চাকরিতে বেরিয়েছে দিনের পর দিন। খারাপ লাগত না। সময় কেটে যেত নাতির সঙ্গে গল্প করে, ছবির বই দেখিয়ে, কিছুটা ঘুমিয়ে। চারটে বেজে যেত ঐভাবে। প্রথমে ফিরত বৌমা। ঢুকেই জিজ্ঞাসা করত, দুধটা খাইয়েছিলেন? কতক্ষণ ঘুমিয়েছে?

সম্বোধনহীন রোজ একই প্রশ্ন। জ্বরজ্বালা হলে বাড়তি প্রশ্ন, আর কি টেম্পারেচার বেড়েছিল নাকি? ঐটুকুই যা শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্ক। কাজের মেয়েটার হাত দিয়ে চা পাঠিয়ে দিত একটু পরে। সঙ্গে আর কিছু না। অনিরুদ্ধ হাতের কাছে কৌটোয় বিস্কুট, মুড়ি রাখতেন। ইচ্ছা হলে তাই খেতেন। নয় খেতেন না। বিস্কুট নাতিই খেত দুপুরে। ছেলেবৌয়ের অজান্তেই বিস্কুট দিতেন নাতিকে। দুধ ছাড়া আর কিছু দেওয়া বারণ। হাত ভালো করে না ধুয়ে কোনো খাবার জিনিস দেওয়া চলবে না। জিওলিন ড্রপ দেওয়া জলে হাত ধুতে হবে আগে। এত কেতা পালন করার অভ্যাস নেই। নাতি ঝোঁক ধরলে দিতে হত। এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেছে কয়েকবার; আপনাকে বার বার বারণ করেছি, ওকে কিছু দেবেন না। অসুখ করলে আমাকেই তো ভুগতে হবে। চাকরি করি আপনি জানেন না!

রাগ করে বৌমা বিস্কুটের কৌটো টান মেরে একদিন বাইরে ফেলে দিয়েছিল।

নিষ্ফল জ্বালাধরা চোখে অনিরুদ্ধ চেয়ে দেখেছিলেন শুধু। ছেলে এলে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বৃথা আশা। ছেলে একটা কথাও বলল না। উল্টে সামনে আসা ছেড়েই দিল, পাছে অনিরুদ্ধ কিছু বলেন। ভাবতে গিয়ে

অভিমানে বুকখানা হা-হা করে ওঠে। যতীশের কষ্ট হবে, অনাদর হবে, এই আশঙ্কায় দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। বাপ-মায়ের আদরে ওকে তিল তিল করে গড়েছেন। নবনীতার কত সাধ ছিল, ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করে তুলবেন। স্ত্রীর ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন অনিরুদ্ধ।

রিটায়ার করার পর প্রায় সর্বস্ব ঢেলে বাড়িটা তুলেছেন। ছেলে যেমন চেয়েছে তেমনিটি। মস্ত হলঘরের মত দোতলায় প্রকাণ্ড একটা ঘর তার জন্যই তৈরি করেছেন। অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম, ওভারহেড ট্যাঙ্কের সঙ্গে গীজারের সংযোগ ঐ বাথরুমেই করে দিয়েছেন। গরম ঠাণ্ডা দুরকম কলের ব্যবস্থা, শাওয়ার, পোর্সিলিনের বাথটব, দামী বেসিন, ফাইবার গ্লাসের বেদিং স্ট্যাণ্ড, এক্সপেলার পাখা—কি নেই বাথরুমটাতে। হাওয়া খেতে খেতে চান করার জন্য ছোট একটা ফ্যানও আছে। সব ছেড়ে দিয়েছেন ছেলে আর বৌকে। নিজে একতলায় পুরনো চৌকিতে শোন। ছোট একটা বাথরুম আছে। তাঁর আর বিলাসিতার প্রয়োজন নেই। নবনীতার সখ ছিল। সে যখন ভোগ করছে না, তিনিই বা করবেন কোন প্রাণে! শাশুড়ীর সখ-আহ্লাদ ছেলের বৌ চুটিয়ে ভোগ করছে। রঙীন টি-ভিও কিনে দিয়েছেন। ওরাই চালায় দিনরাত। চালক। তাঁর টি-ভির কোনো দরকার নেই। ভোগের দিন চলে গেছে। এখন মায়া কাটাবার পালা। চলমান জগতের নর্তন-কুর্দনের দৃশ্য তাঁর কোনো কাজে আসবে না।

ধীরে ধীরে উঠলেন। নাঃ, বসে বসে স্মৃতিচর্বণ করে কোনো লাভ নেই। একটু চা করে খেতেই হবে। উপরে উঠে গেলেন আস্তে আস্তে। টেবিলে উচ্ছিষ্ট চায়ের কাপপ্লেট, খাবারের টুকরো, ডিমের খোসা ছিটিয়ে ছত্রখান হয়ে আছে। কেটলি ছাঁকনি সব আ-ধোয়া পড়ে। অন্য সময় হলে নিজেই ওসব ধুয়ে ফেলতেন। কিন্তু ইচ্ছা করল না। হঠাৎ নজর পড়ল গ্যাস-সিলিণ্ডারটার উপর। একটা স্লিপ ঝুলছে—"গ্যাস শেষ হয়ে গেছে—বুক করে দেবেন।" পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জলে গেল। বৌয়ের এতবড় স্পর্ধা! দ্বিতীয় সিলিণ্ডারটাও খালি।

কিন্তু কাজের মেয়েটা আসবে কিনা কে জানে। ভাবতে ভাবতে শরীরটা ঘুলিয়ে উঠল ঘৃণা, লজ্জা, অপমানে। কাজের মেয়েটিকে কেন্দ্র করে পরশুদিন কী বিশ্রী কাণ্ড ঘটাল তাঁর বৌমা—বড় সাধের বৌমা—যাকে হাজার বার বাজিয়ে পছন্দ করে ঘরে তুলেছিলেন! অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়। শুধু শুধু পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করা। পিতৃপ্রতিম শ্বশুরকে বিপাকে ফেলা। অনর্থক এত বিরাগের কারণ কি? শ্বশুরের বাড়িতে বাস করতে লজ্জা লাগে না, লজ্জা লাগে না তার পেনসানের প্রতিটি পাইপয়সা উশুল করতে! পরশুদিনের ঘটনাটা ভাবলে তেতো হয়ে যায় সব কিছু। মনে হয়, আর কেন? আর কতদিন? এবার বিদায় নিলেই হয়। এখনও অথর্ব হননি। হাত-পা থাকতে থাকতে চলে যাওয়ার ভাগ্য কি তাঁর হবে!

পরশুদিনের কথা। তিনটে নাগাদ দাদুভাই ঘুম থেকে উঠেছে। দুধ গরম করে খাইয়ে দিয়েছেন। কাজের মেয়েটা অন্যদিন চারটের পর আসে। সে হঠাৎ এসে পড়ল। বললে, আজ সিনেমা চললাম বাবু। দিদিমণিকে বলে দেবেন।

—বাসনগুলো ধুয়ে দিয়ে যাবে না? অনিরুদ্ধ বলেছিলেন।

—না বাবু, দেরি হয়ে যাবে। সকালে হবেক।

অনিরুদ্ধ আর কিছু বলেননি। কিন্তু ব্যাপারটা যে জটিল আকার ধারণ করতে পারে তা ভাবতে পারেননি। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেই বৌমাকে অনিরুদ্ধ কথাটা জানিয়েছিলেন। বৌমা সঙ্গে সঙ্গে রেগে অগ্নিশর্মা, কি বললেন? সিনেমা গেল? আপনি পয়সা দিয়েছেন?

—কৈ না তো!

—না-তো? মিছে কথা বলার জায়গা পেলেন না? পয়সা না দিলে সে এসেছিল কেন? এত কাজ আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, তাতে আপনার কি যায় আসে! সন্ধ্যেবেলায় দু'চারজন বেড়াতে আসার কথা, আর আজই এই কাণ্ড করলেন আপনি!

—আমি কাণ্ড করলাম! বিস্মিত হয়ে অনিরুদ্ধ বলেছিলেন।

—আর কথা কইবেন না! লজ্জা করে না বুড়ো বয়সে ঝিয়ের সঙ্গে মাথামাথি করতে! বৌ না থাকলে এই বয়সে এমনই হয়!

—ছিঃ ছিঃ, কি বলছ বৌমা? আশেপাশের লোকে

শুনলে ভাববে কি ?

—শুনুক ! আমি তো তাই চাইছি, তবে যদি আপনার লজ্জা হয় ! ঝি রেখেছি আমি, তাকে ছুটি দেন কোন্ সাহসে ?

দাপাতে দাপাতে বৌমা দাদুভাইকে টানতে টানতে উপরে চলে গেল। সেখান থেকেও তার অকথ্য রচনামৃত বর্ষিত হতে লাগল। অনিরুদ্ধর মনে হল, ঘাড় ধরে পুত্র-বধূকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। যৌবনের প্রদীপ্ত অহংবোধ দপ করে পিছন থেকে নতুন করে জেগে উঠেছিল কেন ? কিন্তু মুহূর্ত-পরেই প্রচণ্ড অবসাদে নুয়ে পড়েছিলেন। ক্ষীণ আশা ছিল, ছেলে এলে এর প্রতিকার হবে। সে তার চরিত্রবান বাপকে জানে। ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে পান-সিগারেট পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো নেশা—ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা, তাস-দাবা কিছুই না তাঁর অবলম্বন। শুধু যতীশ আর যতীশ।

যতীশ যথাসময়ে এলো। দেখল তাকিয়ে। বাবা অবসন্ন হয়ে পড়ে আছেন। অনিরুদ্ধ ভেবেছিলেন, ছেলে জিজ্ঞাসা করবে কিছু। করল না। বাধ্য হয়ে বলতে হল, বিশ্রাম করে একবার এখানে আসিস খোকা, দরকারী কথা আছে।

যতীশ বললে, আচ্ছা। তারপর ভিতরে চলে গেল।

সন্ধ্যার মুখে তিন চার জন মহিলা, বোধ হয় বৌমার বান্ধবী, বেড়াতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে হৈ-হট্টগোল চলল ৯টা পর্যন্ত। ওঁদের বিদায় জানাতে ছেলে-বৌমা নেমে এলো। যতীশ একটু ইতস্ততঃ করে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর বললে, আপনি কি বলবেন জানি। সবই শুনেছি। আপনার আচরণ আমি সমর্থন করতে পারলাম না।

ঃ কি ? কি খোকা, তুইও একথা বললি !

কথা বাড়ায়নি যতীশ। দ্রুতপদে স্ত্রীর সঙ্গে উপরে উঠে গিয়েছিল।

অনিরুদ্ধ সেদিন রাত্রে কিছু খাননি। খাবার পড়েই ছিল। খাবার নয়—বিষ। কতখানি অশ্রদ্ধা, কতখানি অবজ্ঞা মিশে আছে ঐ তিনখানা রুটি-তরকারীর মধ্যে তা তাঁর চেয়ে কে আর বেশী জানে ! সকালে কাজের মেয়েটা এসে খাবারের থালা সরিরে নিয়ে গিয়েছিল। কেন তিনি খাননি, কেউ জিজ্ঞাসা করতে আসেনি। সকালে বাইরে দোকানে চা খেয়ে এসেছেন। দুপুর-রাত্রের খাওয়া হোটেলে সেরেছেন। কিন্তু তাতে ওদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যতীশ এমন অমানুষ, এমনি হৃদয়হীন যে কিভাবে হয়ে উঠল—অনিরুদ্ধ ভেবেই পেলেন না। শাস্ত্রে নাকি বলেছে, পরলোকে পুন্নাম নরক থেকে মুক্তি পেতে পুত্রের প্রয়োজন। মিথ্যে—সব মিথ্যে। পুত্র আছে বলেই না আজ ইহলোকে পুন্নাম নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ! তীব্র একটা দংশনজ্বালা বুকের ভিতর অবিরত বোধ করতে লাগলেন। মনে হল, আর দেরি নেই। মৃত্যু আসছে পা টিপে টিপে। একটা স্ট্রোক হোক মনেপ্রাণে কামনা করছেন। ওষুধপত্র আর খাবেন না। হাতের কাছে একটা থলিতে নানারকম ওষুধ থাকে তাঁর। সব ফেলে দিলেন। কি জন্য বাঁচবেন ! কার জন্য বাঁচবেন ! কি দেখতে বাঁচবেন। কিন্তু এই বাড়ি ? এতবড় বাড়ি ? দু লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। বুকের রক্ত ঢেলে সারাজীবনের সঞ্চয়ের কড়ি দিয়ে তৈরী বাড়ি কেন যে করলেন ! নাঃ, কোনো মোহ কোনো আকর্ষণ রাখা উচিত নয়। কিছুই তো সঙ্গে যাবে না। ভাবতে ভাবতে বুকে একটা টান অনুভব করলেন। আউড়াতে থাকেন ঃ আয় ! আয় ! তাড়াতাড়ি এসে আমাকে বাঁচা ! নাঃ, শেষ পর্যন্ত এলো না। ব্যথাটা ভালো হয়ে গেল।

ওরা গেছে সাউথে। নিশ্চয়ই এল-টি-সি পেয়েছে। পাক। একবার বলে গেল না ! চাবিটাও বাপকে বিশ্বাস করে দিয়ে গেল না ! নাহ্, এখন মরলে চলবে না ! এর শেষ দেখা চাই।

২

যেমন গিয়েছিল, তেমনিভাবে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাড়ির দরজায়। দেখে অবাক হল যতীশ, বাইরের বারান্দায় গ্রীলের পাশে খাট, গদি, আলমারী আর ড্রেসিংটেবিল ডাঁই করে রাখা। ধুলো জমেছে। বৃষ্টির ছাটে ভিজেওছে। বৌ ককিয়ে উঠল, ড্রেসিংটেবিলটা আমার বিয়ের মনে হচ্ছে !

চিন্তিত হয়ে উঠল যতীশ, তাই তো ! কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না !

তাড়াতাড়ি ডোরবেল টিপল। একটু পর এক অপরিচিত ভদ্রলোক দরজা খুলে পথ আটকে দাঁড়ালেন।

: আপনি কে ?

: সে প্রশ্ন আমিই করতে পারি !

: তার মানে ? এটা আমার বাড়ি !

: আপনার বাড়ি ? দলিল আছে ?

যতীশ থতমত খায়, না, আমার মানে, আমার বাবার। কোথায় তিনি ?

: ওঃ, আপনি অনিরুদ্ধবাবুর ছেলে ! ভালো ভালো, আপনার বিয়ের দানসামগ্রী ঐ ফার্নিচারগুলো আর ফটো ইত্যাদি জিনিস ঐ বারান্দায় জড় করা আছে—একটা রসিদ দিয়ে নিয়ে যাবেন।

: আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন ! একথা বলার কি অধিকার আপনার আছে ?

: অধিকার আছে বৈকি। এই বাড়ির মালিক আমি। আপনার বাবার কাছে তিন লাখে কিনেছি। তা তিনি এমনই সজ্জন, সে টাকার সবটাই চ্যারিটি করে দিয়েছেন।

ককিয়ে উঠল যতীশ, বাবা কোথায় ? কি তার ঠিকানা ?

: ঠিকানা ? ভিরিঙ্গিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। দাঁড়ান ঠিকানাটা দিচ্ছি।

ভদ্রলোক ডায়েরী থেকে ঠিকানা এনে দিলেন।

ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়েছিল, ভাড়া পায়নি বলে। ওটাতেই ভিরিঙ্গি ছুটল যতীশ বৌ-ছেলেকে নিয়ে।

সরু গলির ভিতর একতলা ছোট্ট বাড়ি। একটি কি দেড়টি কামরার বেশী নয়। হতচকিত যতীশ দরজায় কড়া নাড়তে লাগল।

দরজার একটা পাল্লা খুলে দাঁড়ালেন অনিরুদ্ধ। নিরুত্তাপ অথচ কঠোর কণ্ঠে বললেন, বড্ড দেরি হয়ে গেছে বাবা !

সশব্দে মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এঘর ওঘর

আশাপূর্ণা দেবী

দ্বিতীয় পর্যায়

(২য় পর্ব)

ভারতবর্ষের মানচিত্রে অতি ক্ষুদ্র একটি রাজ্য অন্যান্য নানা রাজ্যের মধ্যে যেন একঠেঙে তালগাছের মতো অবস্থান করছে, যার নাম 'পশ্চিমবঙ্গ'। বাজার-চলতি ভাষায়—'ওয়েস্ট বেঙ্গল'।

মানচিত্র আঁকিয়েরা এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির ছবিখানি "ওয়েস্ট-পেপার বক্সে" নিক্ষেপ না করে যে রেখে দিয়েছেন এই আশ্চর্য! কারণ সে তো আর সত্যিকার মাঠের তালগাছের মতো "এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে আকাশে উঁকি মারতে" চাইছে না। সে বাসনাই নেই তার! 'একঠেঙে' তো বটেই, আবার 'ত্রিভঙ্গ মুরারি'ও, 'পশ্চিম', 'দক্ষিণ' আর 'উত্তর'। 'পূর্ব'টা কবে যেন আকাশের স্বপ্ন দেখে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে নতুন মানচিত্র আঁকিয়েছে!

এখানে—ওই ত্রিভঙ্গ! আর ত্রিভঙ্গের মধ্যেই কতো 'ভঙ্গ' কতো 'রঙ্গ'!

কবিরা দূরদ্রষ্টা।

তাই শতবর্ষ পূর্বে এক কবি বলে গিয়েছিলেন : "এতো ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা।"

তা এই ত্রিভঙ্গ মুরারি বঙ্গদেশের এতোকাল জীইয়ে থাকার প্রাণশক্তি বোধহয় ওই রঙ্গটুকুই। যেটা নাকি তার রাজধানী, প্রধান শহর 'কলিকাতা নগরী'র অঙ্গে অঙ্গে সর্বদা হিল্লোলিত।

জন্মকালে নাকি ওর নাম ছিলো 'কলিকাতা বন্দর'। যেখানের একটি নামহীন ঘাটে অবতরণ করে তার গডফাদার জব চার্ণক তাকে বন্দর নাম থেকে নগরী নামে উন্নীত করেছিলেন!

সেটা এখন থেকে ঠিক কতোকাল আগে তার হিসেব কষা শক্ত। যদিও—কিছুকাল আগে তার জন্মের তিনশো বছর পূর্তি উৎসবে ওই কলিকাতা নগরী নাগরীরূপে অপরিসীম সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সর্বাঙ্গের অলঙ্কারের জেল্লা ঠিকরে ঝমঝমিয়ে ঘুঙুর বাজিয়ে নেচেছিলো! তার সঙ্গে সারা কলকাতার বাবুবিবির দল এমন কি গাড়ি-ঘোড়াদেরও নাচিয়েছিলো।...

সেই মত্ত মাতন উৎসবের স্মৃতি এখনো কোনো কোনো অতিবৃদ্ধের শৈশবস্মৃতির মধ্যে ছায়া রেখে দিয়েছে। তাঁরা স্মৃতিচারণ করেন মাঝে মাঝে।

'অতিবৃদ্ধের' সংখ্যাও তো আজকাল বেড়েছে! একালের মানুষরা তো প্রায় শতবর্ষের পরমায়ুর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই টিকে আছে!

তা তারা মানে সেই অতি বুড়োরা স্মৃতিচারণ করে বটে! তবে সেটা কবে ঘটেছিলো তার সাল তারিখের হিসেব দিতে পারে না। কারণ 'কলিকাতা' তো আর এখন কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হিসাবে গণ্য নয়। সে হিসেবটা হয়তো নগণ্যই।

এখন তার নাম বলতে পারা যায়—একটি 'আন্তর্জাতিক

শহর'।…বহুজাতিক অবস্থান অধ্যুষিত এই নগরে বহুবিধ ক্যালেণ্ডার!

কারণ যাঁদেরই অবস্থান তাঁদেরই স্লোগান—'আমাদের দাবি মানতে হবে।'

কাজেই এই বঙ্গভূমিতে 'বঙ্গাব্দেরই' এখন কায়ক্লেশে অবস্থান। অফিস আদালতে কোর্টকাছারিতে অবশ্য ওই 'বঙ্গাব্দের' কোনো দিনই তেমন প্রতিষ্ঠা ছিলো না। যেটা ছিলো—তার নাম খৃষ্টাব্দ! এখনো বিশ্বব্যাপী যার প্রতিষ্ঠা!…

তো এখন ওই অফিস আদালতে—ওই খৃষ্টাব্দের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক ভাবেই জায়গা দিতে হয়েছে—'শকাব্দ', 'জৈনাব্দ', 'হিজরি মুং অব্দ'…"গুরু নানকাব্দ" 'বৌদ্ধাব্দ' 'গৌরাঙ্গাব্দ' অতঃপর 'বঙ্গাব্দকেও'। তো এতোগুলো 'অব্দের' হিসেব কষতে গিয়ে জব্দ হয়ে যাওয়া বর্তমানকাল মাথা গুলিয়ে ফেলছে। বলতে পারছে না কতোকাল আগে কলিকাতা যেটের তিনশো বছরেরটি হয়েছিলো!…তবে মনে হয়—খুব অনেক বেশী কাল নয়।

বেশী হলে—আবার তো এখন থেকেই চারশো বছরের পদার্পণ উৎসবের উদ্যোগে ঢাকঢোল বাজতে শুরু করতো।…

হ্যাঁ, উৎসব! উৎসবই হচ্ছে এই মহানগরীর ধ্যান জ্ঞান আনন্দ! যে কোনো উপলক্ষে একখানা উৎসব লাগিয়ে দিতে পারলেই হলো!…বিদেশী পর্যটকদের চোখধাঁধানো সেই সব লাখ লাখ টাকার উৎসব দেশবাসীকেও ধাঁধিয়ে রাখে। উৎসবের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে তারা ভুলে যায়, তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই। পায়ের তলায় মাটি নেই।…যে মাটিটুকুতে ঘষটে ঘষটে চলছে—তার সর্বত্র গর্ত গোদা খানাখন্দ!

না থাকুক! 'কুছ পরোয়া নেই! চালাও পানসি বেলঘরিয়া—'

এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি!

তবে বাঙালিরা এখন এই কলিকাতা নগরীতে অনধিকারী বহিরাগতের ভূমিকায়!…আপাতদৃষ্টিতে কলকাতা তার হাত পা বাড়াতে বাড়াতে যতই বৃহৎ হোক আর বৃহত্তর কলিকাতা নামে গৌরব বোধ করুক, সমগ্র কলকাতার মালিকানাটি চলে গেছে অবাঙালি মহাজনদের কবলে!

তাঁরাই কলকাতাকে ইচ্ছেমত ভাঙছেন গড়ছেন রাখছেন ফেলছেন! একদার কলকাতার পুরনো ঐতিহ্যবাহী যে সব বাগবাগিচা মর্মরপ্রাসাদ বিশেষ স্থাপত্যসমূহ ছিলো তাদের নাম পালটে গেছে। পুরনো কলকাতার মানচিত্র এখন ফসিল মাত্র।…

তো বর্তমানের মালিকরা এবারে বায়না তুলেছিলেন, অতো খামচে খামচে নাম বদলে কী লাভ? পুরোপুরি বদলে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়!…'কলিকাতা' নামটাই বাতিল করে ফেলে নতুন কিছু হোক।

কিন্তু সেই তখন?

তখন হঠাৎ মরা নদীতে বান ডাকলো। মরা বাঙালি, ক্ষয়া বাঙালি, স্যাৎপেতে বাঙালি, আত্মহারা বাঙালি হঠাৎ যেন বীরবিক্রমে জেগে উঠেছিলো।…সকলে এককাট্টা হয়ে (যেটা বাঙালির হাড়েমজ্জায় নেই, সহসা তাই হয়ে)… নিজস্ব 'ভুনি খিচুড়ি' ভাষায় বলে উঠেছিলো: "মেরা ক্যালকাটা নেহি হুঙ্গি।"

তা সেই এককাট্টার ফল ফলেছিলো—নামটা পুরোপুরি বদল হয়ে যায়নি।…এখন যে কলকাতার ওপর কালের ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে, তার নাম হচ্ছে—'নব কলিকাতা' অথবা 'নিউ ক্যালকাটা'।…

কেন নয়?…'নিউ দিল্লী'কে মেনে নেয়নি দিল্লীবাসীরা? সেখানের বসবাসকারী বাঙালিরা বিশুদ্ধ ভাষায় বলে না "নতুন দিল্লী'!

প্রবাসে গেলে আবার নিজবাস সম্পর্কে ভালোবাসা একটু উথলে ওঠে তো!

তা 'স্বর্গনগরী' 'নিউ দিল্লীর' মর্চে-পড়া অংশটুকু যেমন 'ওল্ড দিল্লী' নামে এখনো বেঁচেবর্তে আছে, এই নিউ ক্যালকাটারও ধসে-পড়া অতীত অংশটুকু এখন 'পুরনো কলকাতা' বা ওল্ড ক্যালকাটা নামে বেঁচেবর্তে আছে।…

এখনো—এই কাহিনীর বর্তমান নায়ক-নায়িকারা তাদের পিতামহ-পিতামহীদের গল্পে আর স্মৃতিকথায় প্রলুব্ধ হয়ে যদি 'ভীম নাগের সন্দেশ', কী 'নবীন ময়রার রসগোল্লা' অথবা 'দ্বারিক ঘোষের রাধাবল্লভী' খুঁজতে যায়, ঠিকই পেয়ে যাবে!…

কারণ কলকাতা আছে—"পুরনো কলকাতাতেই"।

তা সে কথা যাক—এখন আমরা কাহিনীর যে পাত্র-পাত্রীদের অনুসরণ করে চলতে চাইছি—তাঁরা ওই 'নিউ ক্যালকাটা' বা 'নব কলিকাতার' রাজপথেই দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছেন।…গাড়ির শোভাযাত্রা! মানুষের সংখ্যার থেকে গাড়ির সংখ্যা বেশী।…অবশ্য মানুষের মতো মানুষদের কথাই বলা হচ্ছে।…চারখানা হাত পা নিয়ে, মানুষ নামক জাতটার আকৃতি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো প্রাণীগুলোকে তো আর 'মানুষ' বলে গণ্য করা যায় না। সেইসব লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া জীবগুলো কোনোমতে গা বাঁচিয়ে হেঁটে মানুষের চলার পথের পাশ দিয়ে চলাফেরা করে।…দৈবাৎ গাড়ির তলায় পিষে গেলে তারা 'ননসেন্স'! আর গা বাঁচিয়ে পালাতে পারলে 'উজবুক'।

এখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

শহর এখন আলোকমালায় সজ্জিত। রাস্তা দেখলে রোজই মনে হয় 'বিয়েবাড়ি'। এই ঝলমলানির মধ্য দিয়ে হাজারখানা গাড়ির লাইনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে চকচকে গাড়িখানা ওই নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে আসা কজনকে নিয়ে ছুটে চলছিলো, তার 'আরোহী-আরোহিনীরা' গাড়ির মধ্যেই মৃদু আনন্দ চালিয়ে চলছিলো!

ওদের মধ্যে অনাহতা নামের তরুণীটি তারুণ্যে ঝলমল করতে করতে বলে ওঠে, আচ্ছা দিম্মাদিদা! তোমার বাবা বুড়ো কী সন্ধ্যেবেলা 'মহৌষধি' পান করে ঝিমোয়?

'দিম্মাদিদা'র অর্থ হচ্ছে এটি মামারবাড়ির দিদা। এই ভাবের মধ্যেই তাঁর পরিচয়লিপি সাঁটা আছে। সেটা অপর-দিকেও আছে। বাড়ির দিদার নামের অলঙ্কার হচ্ছে—"ঠাম্মাদিদা"!

তা দিম্মাদিদা, যাঁর নাম নাকি চকিতা, তিনি চকিত হয়ে বলে উঠলেন, তার মানে? আমার বাবার জীবনেও ওসব বদভ্যাস নেই তোর বাবার মতো!

আমার বাবার মতো? হি হি! বল যে তোমার জামাইয়ের মতো! তা' সেটা এমন আশ্চয্যি কী হে? সত্যিকার সভ্য শিক্ষিত কালচার্ড লোক মাত্রেই তো অন্তত সন্ধ্যেবেলা ওই মহৌষধির প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকেন! তোমার বাবা বুড়োকেও তাই ভেবেছিলুম!

ঠিক আছে। তো হঠাৎ নতুন করে ভাবার কারণ?

ওই তো—যেই ফোনে খবরটা দিলাম—মাসীর একসঙ্গে দু'দুটো সম্পত্তি লাভ হয়েছে, সেই শুনে কেমন ঝিমুনো গলায় বললো, তাই নাকি? এ বংশে এটা মনে হচ্ছে নতুন!… আমিই বা ছাড়ি কেন? বললাম, মাসীর বাচ্চারা কী আপনার বংশের? ওদের পদবী কী আপনার মতো 'স্যানিয়েল' হবে?…তখন বললো, সরি! আমার ভুল হয়েছে!… তারপর অবশ্য চাঙ্গা হয়ে বললো, দুবাইয়ের ভাবখানা কী? খুশী, না ভীত?

তুই কী বললি?

কী আবার বলবো? বললাম, সেটা কী আপনার 'দুবাই' আমাকে বলতে বসলেন?

এই সময় দুবাই বলে উঠলো, আঃ! গাড়িতে এতো কথা কেন?

দুবাইয়ের বাবা, অর্থাৎ 'কর্তা'র পোস্টে থাকা 'লোকটি' বলে ওঠেন, সত্যি! এই তোর একটা দোষ, যতো কথা গাড়িতে।

বাঃ, এখন আর দোষটা কী? ড্রাইভার তো নেই!

থাকলেও তোমাদের কথার কিছু কমতি হয়? আমি তো ভেবে পাই না, সব কথাই যদি গাড়িতেই ফুরিয়ে ফেলা হয়, বাড়ির জন্যে কী থাকবে?

ওঃ, দাদাইদাদু! আপনার কী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী! কথার স্টক কী এতোই কম আমাদের আপনার মতো, তাই সব ফুরিয়ে যাবে? এ হচ্ছে অফুরন্ত সমুদ্র!

তাহলেও গাড়ির চালকের এতে অন্যমনস্কতা আসতে পারে, আর তার ফলে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া আজ তোর মামার—

ওঃ, দাদাইদিদা! কী থেকে যে কী হতে পারে, তা যে কী করে আপনাদের মাথায় আসে! আচ্ছা বাবা, এই চুপ করলাম! স্পীকটি নট!

দুবাই একটু লজ্জিত হয়ে বলে, না না, তুই চালিয়ে যা! আমি ঠিকই চালাবো!

নাঃ, থাক! একই সঙ্গে দুই সন্তানের পিতা বনে যাওয়া! একটু ভারীই তো! কিন্তু আচ্ছা মামা, তোমার কী মনে হচ্ছে?

কিছুই না। শুধু মনে হচ্ছে, নাতনীকে ঠিকমতো কেয়ারে

রাখবে কিনা! ভবিষ্যতে কেমন থাকবে!

ওঃ, তার মানে—

ভাগ্নী অনায়াসে সম্পর্কজ্ঞান তুচ্ছ করে বলে ওঠে, তার মানে তোমার মধ্যে এখনো পিতৃস্নেহ গজায়নি। মনপ্রাণের সবটাই ইয়ে—তোমার নাতনীতে আচ্ছন্ন! এই তো?

দিন দিন বড্ড ফাজিল হয়ে উঠছিস তুই! তার থেকে ওই 'স্পীকটি নট্‌ই' থাক!

হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে থামিয়ে ফেলে গাড়িটাকে। বলে, আঃ, রাত্রেও এদের কী উৎপাত! মরছিলো একটা নেড়ি কুকুরের ছানা!

ছানা! আহা! ইস! কিন্তু কুকুর বেড়ালদের মধ্যে শুনি মাতৃস্নেহ খুব বেশী! একসঙ্গে গোটা চার পাঁচ বাচ্ছা হয় বটে, তবু মা-কুকুর কি মা-বেড়ালটা খুব সতর্ক থাকে। খুব আগলায়।

চকিতা বলে ওঠেন, সে আরো ছোট্টবেলায়! যতোদিন মার দুধ খায়!…দুধ ছাড়লেই মা আর নিজের বাচ্চাদেরই চিনতে পারে না! মানুষের সঙ্গে এইখানেই কুকুর বেড়ালের ফারাক!

কর্তা হঠাৎ একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেন, শুধু ওই-খানেই?

আঃ, থামো তো! তুমি আর সবসময় তোমার ওই পেটেন্ট হাসিটি হেসো না বাপু! তো ভুলটা কী বলেছি? হিসেব মিলিয়ে দেখো—অন্য প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের আর কোথায় কোথায় তফাৎ?

দিদাদাদুর এই তাল ঠোকা অবস্থায় অনাহতার অবশ্য আহত হবার কিছু ছিলো না। হলোও না। শুধু ওদের তর্কের উদ্যত ভঙ্গীকে আহত করে বলে উঠলো, আচ্ছা দিম্মা দিদা, ওরা তো একসঙ্গে তিনটে চারটে বাচ্চাকে নিজের দুধ খাইয়ে 'মানুষ' করে তোলে—মানে আর কী বেড়াল কিম্বা কুকুর করে তোলে! ওদের তো আর ফীডিং বটল্‌ও নেই বেবি ফুডও নেই! তো মামী তার দু'দুটোকে নিজের দুধ খাইয়ে মানুষ করে তুলতে পারবে?

আঃ অনু, তুমি থামবে?

দুবাই বলে ওঠে, দিন দিন কী অসভ্য হয়ে উঠছো তুমি? অনায়াসে এইসব অশ্লীল কথা মুখে আনছো?

অশ্লীল! ওঃ! অথচ কাগজপত্রে তো অবিরতই লেখা হয় "মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই"!

অনাহতা এখন আহত হয়ে চুপ করে যায়।

… … …

অতঃপর গাড়ি নীরবে চলতে থাকে, হাজারখানা গাড়ির মধ্যে থেকে গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে!…

আর অবশেষে—

বৃহত্তর কলকাতার একটি প্রত্যন্ত প্রান্তে আকাশ-ছোঁওয়া একটি ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে!

কম্পাউণ্ডের গেটে বিরাট ফলকে লেখা "দূরের মায়া অ্যাপার্টমেন্ট!"

অর্থাৎ সেই ভুনি খিচুড়ি ভাষা।

গেটের মধ্যে গাড়ি ঢুকে গেলো।

সিঁড়ির সামনেই লিফটএর বেল।

টেপা মাত্রই নেমে আসতে থাকে একটি লোহার খাঁচা।

এবং একসময় তার একটি খোপে ভরে ফেলে এই প্রাণী কটাকে।

এই সময় অনাহতা বলে উঠলো, ইস! খুব ভুল হয়ে গেলো মামা! আমাকে তো আমাদের ওখানে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারতে!

কেন? এ বাড়িটা কী দোষ করলো? এখন তোর কথার স্টকের ছিপি খুলগে যা দিম্মাদিদার কাছে।

নাঃ, এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আমারই বলা উচিত ছিলো!

চকিতা নাতনীর দিকে একটি চকিত দৃষ্টিপাত করেন। আর কিছু না, রাগ অপমান, ওই যে মামা মুখ ফস্কে কী একটা বলে ফেলেছিলো!…এ যুগের মেয়েদের অন্ত পাওয়া ভার। কখনো আহ্লাদী কচি খুকীর ভূমিকায়, কখনো মহামান্যগণ্য মহিলার ভূমিকায়! এখন আমারই প্রাণ যাবে মান ভাঙাতে!

… … …

তা সত্যিই তো বাপু। তুই বা এমন একখানা আপটু-ডেট্ মেয়ে মামা দাদামশাইয়ের সামনে 'মায়ের দুধ'এর মতন একটা অশ্লীল কথা মুখ দিয়ে বার করলি কী করে?

… … …

বৃহৎ করিডোর! হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা!

নিজেদের নম্বরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, হাতব্যাগ থেকে চাবি বার করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ঢুকে আসেন চকিতা।...

নাঃ, এখানে কোনো উৎকণ্ঠিত মুখ অপেক্ষা করে নেই 'কী খবর ?' জানতে !...শূন্য ঘরে পদার্পণ !

হঠাৎ মনে পড়লো, চকিতা যখন তাঁর প্রথম সন্তানের সন্তান ওই 'অনাহতার' জন্মকালে ঘণ্টাআষ্টেক কী যেন সেই একটা নার্সিংহোমে কাটিয়ে, 'অপারেশন সাকসেস' শুনে বাড়ি ফিরেছিলেন তখন তাঁর শাশুড়ী কী উৎকণ্ঠিত মুখে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলে উঠেছিলেন, সব ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে তো চকিতা ?

তারপর উত্তর শুনে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন, সারাবাড়ি খুঁজে শাঁখটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। ভেবেছিলাম বাজিয়ে বসে থাকবো। তা যাক গে, সে আর দরকার হলো না। তবু মনে মনেই শাঁখে ফুঁ দিই। হলেও মেয়ে সন্তান—তবু এই প্রথমটি তো !

তারপর কতোক্ষণ সেই কী উদ্বিগ্ন প্রশ্ন—মেয়ে কেমন আছে ! সদ্যোজাতটি কেমন আছে !...

আর আজ ?

নাঃ, কারো বাড়িতে এখন আর কোনো উদ্বিগ্ন মুখ অপেক্ষা করে না !

বাড়ি, মানে ফ্ল্যাটে !

পরিবারের নেহাৎ বুড়োবুড়ীরা ?

মানে এযুগের পরমায়ু পাওয়া, 'বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধরা' ?

তাদের আর এইসব ছবির মতন ফ্ল্যাটে ঠাঁই হবে কোথায় ?...তাদের জন্যে তো অসাধারণ ভালো ভালো সব বৃদ্ধাশ্রম নির্মিত হয়েই চলেছে !

চকিতার শ্বশুরশাশুড়ী কেউই বেঁচে নেই, অতি বৃদ্ধ হবার আগেই গত হয়েছেন, এই যা রক্ষে !

কিন্তু কার রক্ষে ?

তাঁদের ?

না তাঁদের অধস্তন প্রজন্মদের ?

... ...

এখন চকিতা উল্লসিত কণ্ঠে টেলিফোনে আলাপচারিতা চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমেই মেয়েকে—হ্যাঁ রে ! শুনলে অবিশ্বাস্য ! ভাবতেও পারিনি ! আচ্ছা তোরা তো বৌমাকে দেখতিস সব সময় ? এমন আশঙ্কা—ইয়ে এমন ধারণা হতো ?...নাঃ, মোটেই বোঝা যেতো না ! অথচ বলছে, দুটোই সমান হেলদি !...তবে একটি ফর্সা, একটি ময়লা !... ইয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো ঠিকই ! এই, অনু আজ আর যাচ্ছে না !...সকালে কলেজ আছে ? থাকুক। দুবাই অফিস যাবার সময় পৌঁছে দিয়ে যাবে। ওর সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে।...

আসলে পরামর্শের দরকার না থাকলেও নাতনীর মান ভঞ্জন করতে সেটা করতেই হবে ! হয়তো জিগ্যেস করবেন, হ্যাঁ রে। দুটো বাচ্চার তো দুটো জেণ্ডার ! ওদের জামাটামা কী রকম কিনে নিয়ে যাবো ? দু রকম ?...

অতঃপর আরো চলতে থাকে।

কোন এক রাঙাপিসিকে, কোন এক নতুনদিকে, কোন এক ক্ষুদে মাসিকে...ফোনে জানান দিয়ে চলা—আমাদের এই লাহিড়ী পরিবারে—আজ একসঙ্গে দুটি প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। একটি বংশধর, একটি বংশলতিকা।...হ্যাঁ, বিনা অপারেশনে। তাজ্জব হচ্ছিস তো ? কী করে এতোটা রিস্ক নিলাম ?...বাঃ, কী করবো ? গুরুদেবের যে বিশেষ বারণ ছিলো, নাতনীর গায়ে অস্ত্র না ছোঁওয়াতে !...সেই তাঁর ক্যালিফোর্নিয়া সেণ্টার থেকে ফোনে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন !...এখনই খবর দিতে ইচ্ছে করছিলো রে ! কিন্তু হবে না, ওঁর চার্টটা দেখে দেখছি, এতোক্ষণ বোধহয় বস্টন সেণ্টারে রওনা হয়ে গেছেন। কাল সকালেই জানাতে হবে। ...কী বলছিস ? দুবাই ? দুবাই রাজী হলো ?...হলো তো ! আসলে সবই গুরুদেবের দয়া ! অথচ ওই ছেলে—এমন কিছুই মানে না !...ওকে গুরুদেব যে বলেছিলেন, অপারেশন করতে গেলেই বিপদ অনিবার্য !...তাহলে আর কোন সাহসে— ? মানুষ এই একটা জায়গায় বড়ো দুর্বল রে ! তোকে বলেই তাই চুপিচুপি বলছি—এমন কী গুরুদেবের পাঠানো ভস্ম, রোজ এক টিপ করে চায়ের সঙ্গে খাইয়েছি বৌমাকে, আপত্তি করতে করতেও করেনি। এখন যাই হোক, আমার মুখটা রক্ষে হলো।...এ্যাঁ, কী বললি ? মুখরক্ষে হলো গুরুদেবেরও ? ছি ছি ! বললি কী ? নাঃ, কার সম্পর্কে যে কী ভাবে কথা বলতে হয়, সে সেন্স তোদের

একদম নেই !…যাক তিনি অবশ্য ক্ষমার অবতার। সবাইয়ের সব হয়েই ক্ষমা করে নেন! আচ্ছা রাখি রে—। এখন ছোড়দিটাকে একবার জানিয়ে দিলেই আপাততঃ!…কী বললি? ছোড়দির ফোন খারাপ? তুই পাচ্ছিস না কদিন? তবে থাক। কেন আর বৃথা পরিশ্রম!…ওদিকে তোর জামাইবাবু তাগাদা দিচ্ছেন—একসঙ্গে নাতি-নাতনীর আবির্ভাবে আজ আর খাওয়াদাওয়া হবে না?…ওই তো—চিরকালই তো ওইরকম খাওয়ার ব্যাপারে মোটে দেরী করতে পারে না!…আচ্ছা! আচ্ছা!…

[ক্রমশ]

প্রতিস্থাপন

(৮ পাতার শেষাংশ)

—নয় তো কি? হসপিটাল অ্যাকসেপ্ট করত নাকি? আপনার রিলেটিভ ছেলেটা, রেকর্ড করা আছে।

—কোথা থেকে পেলে?

—ওসব জিজ্ঞাসা করবেন না, প্লিজ। আপনার কাজ তো হল।

—হ্যাঁ, তা হল। কিন্তু ছেলেটার পরিচয় জানাতে এত আপত্তি কেন?

—দেখুন মিঃ মিত্র, এ সমস্ত আমাদের বিজনেস সিক্রেট। হাই প্রোফাইল পারসোন্যালিটি আছে এই বিজনেসে। আমি তো সামান্য এজেন্ট। রিকোয়েস্ট করছি, বেশি কৌতূহল প্রকাশ করবেন না।

রাতে হোটেলে এসে পিটার স্কটের ছিপি খুললাম। আজকেও আকণ্ঠ পান করল হিমাংশু। আজকেও বার বার 'ডোণ্ট মাইণ্ড' 'ডোণ্ট মাইণ্ড' করতে লাগল। বীথির সুস্থতার চিয়ার করল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আন্নামালাই রোডের ছুটন্ত ব্যস্ততা, সারিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের উজ্জ্বল আলোর কারুকার্য দেখছি। বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বাতাস আমাকে স্নিগ্ধ করছে। বীথির রোগমুক্তি, আমার এই কদিনের প্রচণ্ড টেনসন, আস্তে আস্তে গ্লাসে সিপ করছি।

একটা ফোন করতে হবে। আমার ছেলে সোহো। দিল্লীতে এম. বি. এ করছে, ফাইনাল ইয়ার। কদিন বাদে পরীক্ষা। ওকে ডিসটার্ব করতে চাইনি, এখন জানিয়ে দিতে হবে ওর মায়ের অপারেশনের খবর, আশ্চর্য হবে, রাগ করবে, কিন্তু ওর ক্যারিয়ার।

দূরে আকাশের গায়ে টিভি টাওয়ারের আলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ফুটে আছে।

সকালে নার্সিং হোমে যাবো, হিমাংশু বলল—তুই যা রাজীব, শরীরটা ভালো নেই, আমি না হয় বিকেলে যাবো।

নার্সিং হোমে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে কার যেন অপেক্ষা করছে স্বরানা। আমাকে ওর নজরে পড়ল না। আজ আবার কি করছে ও এখানে!

একটা নীল মারুতি এসে থামল। হাত তুলে সংকেত করে এগিয়ে গেল স্বরানা। স্বতঃই কৌতূহল, কি করছে লোকটা?

মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা। শালোয়ার কামিজ পরা। তবে বাঙ্গালী। খুব সন্তর্পণে হাত ধরে এক পেসেন্টকে নামাচ্ছে। ফিমেল পেসেন্ট। ভদ্রমহিলা হাত দিয়ে পেসেন্টের কোমর জড়িয়ে এনট্রান্সের দিকে এগোচ্ছেন। পিছনে স্বরানা। বাঁক ঘুরতেই রোগীর মুখটা দেখতে পেলাম। ঝ্যাক্ করে শরীরের ভিতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। রূপা! হ্যাঁ, রূপাই তো! এখানে রূপা! এভাবে! আবার স্বরানা! ভিতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে স্থিতু করার চেষ্টা করছি। একটা অদৃশ্য সুতোর জট যেন তিরতির করে খুলছে।

ভিতরের ইমোশনকে সংযত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছি। একই রকম আছে রূপা। একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে, আর চোখের দৃষ্টি একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় অ্যাবনরম্যাল। মুভমেণ্টও। আমার সামনে দিয়ে রূপাকে নিয়ে যাবার সময়ে আমার দিকে চোখ পড়ল স্বরানার—হাই মি. মিত্র।

—হাই, পেসেন্ট নাকি!

—না, ডোনার। আগামীকাল একটা কেস আছে,

তা আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ? মিসেসকে দেখতে যাবেন ?

—হ্যাঁ।

স্বরানা দাঁড়াল না। খানিক সময় লাগল নিজেকে সামলাতে। অবিশ্বাস্য সমস্ত ব্যাপারটা। প্যানোরামার মত আমার সামনে দিয়ে ঝড়ের মত আমার অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে গেল। সমস্ত চিন্তা ভাবনা বিক্ষিপ্ত এখনও, অনির্দেশ। ভিজিটার্স হলে কাউণ্টারের সামনে সোফায় গিয়ে বসলাম। একটা সিগারেট ধরালাম। প্রথমে আমার মাথায় যেটা এল—রূপাকে বাঁচাতে হবে। ইস্, রূপা যদি বীথির ডোনার হত। আর হিমাংশু দেখত! হয়তো ও কিছু তেমন বলতো না, কি জানি ওসব ভাবতেও ভিতরটা যন্ত্রণায় খুবলোচ্ছে। সারা জীবন এই বিকট যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে যেতে হত আমাকে। ইমপসিবল। রূপা। নিষ্পাপ নির্মল সুন্দর মেয়ে, সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু করে দেওয়া। ছিঃ ছিঃ, এই বিজনেস! মানুষের শরীর! র মেটেরিয়াল। ভাবা যায়! কোন একটা ইংরিজি ফিকশনে এমন ঘটনা পড়েছিলাম—কিন্তু তা যে আমার জীবনে! ছিঃ ছিঃ, ভাবতে পারছি না। কিডন্যাপ করে! স্বরানা বলেছিল হাই প্রোফাইল পারসোনালিটি এর মধ্যে আছে। সারা দেশ জুড়ে। বীথির ট্রান্সপ্লান্ট হয়ে গেছে। এই ছেলেটাকে নিশ্চয়ই কিডন্যাপ করে। আমিও তো জড়িয়ে গেলাম।

এই ভাবনাটাই আমাকে ধাক্কা দিল। আমিও তো জড়িয়ে গেলাম। এখন এই নিয়ে যদি খোঁড়াখুঁড়ি করি, তাহলে বীথির জীবন বিপন্ন হতে পারে। স্বরানা ধূর্ত, বাস্তু-ঘুঘু—আমাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে। সমস্ত কাগজে আমার সই। এই নার্সিং হোম চেনের মধ্যে কোন স্ক্যাণ্ডাল চাইবে না, হয়তো রূপাকে সরিয়ে দেবে অন্য জায়গায়। বীথিরও ক্ষতি হতে পারে।

পর পর কয়েকটা সিগারেট খেলাম, ঘড়ির কাঁটা সময়কে বয়ে নিয়ে চলেছে। ভিজিটিং হল রোগীর আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ। ডাক্তার, নার্সিং স্টাফ ও অন্যান্য কর্মচারীরা ব্যস্ততার সঙ্গে যাওয়া-আসা করছে। ট্রলিতে রোগী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুন্দর ঝকঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গরিমাময় পবিত্রস্থান এই নার্সিং হোম। রোগ ফেলে দিয়ে হাসিমুখে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ফিরে চলেছে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগী। অর্থের বিনিময়ে সেবা আর সুস্থতা। ওই ছেলেটা, ওর নামও জানি না। এখনও বোধ হয় হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে শোকাহত ওর বাবা-মা, আত্মীয়রা। বীথির প্রাণ বাঁচালো। হিমাংশু যদি ফিরে পেত রূপাকে।

এ সব আমি ভাববো কেন ? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। এসব তো জানতাম না আমি। পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিয়ে কিডনি কিনেছি বাজার থেকে। আমি জানতামও না। আমি কোন ক্রাইম করিনি, কেন সে করতে যাবো!

এত সব ভাবলে বাঁচা যাবে না। কিন্তু রূপা! না, আমি কিছু দেখিনি, কিছু জানি না।

উঠলাম সোফা থেকে। একটাই কাজ আমার সামনে, বীথিকে একবার দেখে সোজা হোটেল। যে করেই হোক আজই প্লেন কিংবা ট্রেনের টিকিট যোগাড় করতে হবে, জরুরী কাজের ছলনা করে আজই হিমাংশুকে কলকাতায় ফেরৎ পাঠাতে হবে, আজই।



দীনজনে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কখন কোন কথা যে মুখে আসে! ফস্ করে বলে ফেলার পর লজ্জা পাই। কে যেন পেছন থেকে ঠেলে দেয়। আমি বলি না। আমাকে বলায়। কে তিনি?

কর্নেল সায়েব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বয়েসের তুলনায় ভারি কথা। এইবার আমার লজ্জা করছে। আমি পালাতে চাইছিলুম। দরজার দিকে এগোচ্ছি, কর্নেল সায়েব গম্ভীর গলা বেশ কিছুটা নরম করে বললেন, 'যাচ্ছ কোথায়! বোসো।'

এইবার আমি খুব জড়সড় হয়ে বসলুম।

কর্নেল বললেন, 'তুমি যখন কিছু বল, তখন বুঝতে পার কী বলছ?'

—আজ্ঞে না।

—তখন তোমার কী হয়?

—মাথাটা কেমন হয়ে যায়! মুখটা আলগা হয়ে যায়। ভাবনা চিন্তা সব শুকিয়ে যায়। আমি অন্যরকম হয়ে যাই।

—এই অবস্থাটাকে কী বলে জান, পসেসড! তোমাকে কেউ অধিকার করেন। এইরকম কতদিন হচ্ছে!

—বেশ কিছু দিন।

—তোমার অতীতটা জানতে ইচ্ছে করছে। একদিন আসতে পারবে আমার বাড়িতে?

—তা পারব, তবে আপনি তো ভীষণ বড়লোক, আমার অস্বস্তি হবে।

—আমার চেয়ে হাজারগুণ বড়লোক আছে। তুমি একবার এসেই দেখ না!

—বলুন, কবে আসব?

—এই রবিবার। সকাল দশটায়। এই নাও আমার কার্ড।

কার্ডটা হাতে নিয়ে আবার রাস্তায়। টাকাটা ফেরত পেয়ে গেছি। বিদিগিচ্ছিরি খিদে পেয়ে গেছে। রান্না করতে আমার একেবারেই ইচ্ছে করে না। অথচ রান্না করতেই হয়। একবার মনে হল বাইরে কিছু খেয়ে নিই। পরক্ষণেই মনে হল, পাঁচ টাকা সম্বল। বাড়িতে চাল, ডাল, গোটা দুই আলু আছে। কোনো রকমে ফোটাতে পারলে রাতটা হয়ে যাবে। আমার গুরু বলতেন, না খেলে কিছুই হয় না, বরং খেলেই শরীর খারাপ। না খেয়ে কটা লোক মরে! বরং গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েই বেশী মরে। আমার গুরু বলতেন, খুব লাউ খাবি। লাউ হল সন্ন্যাসীদের খাদ্য। পেটে থাকে অনেকক্ষণ। শরীর শীতল হয়। কামনা-বাসনা মরে। ওই দুটোকে মারতে পারলেই তুমি রাজা। যত বন্ধন তো, ওই দোনো চিজকে লিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসভাঙা ভিড়ে তলিয়ে গেলুম। সবাই ছুটছে বাড়ির দিকে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। এই মানুষগুলোকে দেখতে আমার খুব মজা লাগে। ঘামতে ঘামতে, কত রকমের কথা বলতে বলতে দৌড়চ্ছে। কেউ আবার বাজার করেছেন। একজন আর একজনকে কী সব বোঝাচ্ছেন। ট্রেনের ঠাসাঠাসি ভিড়ে সবাই কথা বলছেন। কেউ খুব উত্তেজিত। এরই মধ্যে একজন গুনগুন করে গান গাইছেন। চাকায় চড়ে চলেছে ভগবানের জগৎ।

আমার ডানপাশে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। মধ্যবয়সী। দেখতে খুব সুপুরুষ। থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'শরীর খারাপ লাগছে আপনার?'

ভদ্রলোক ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'আমার খুব অসুখ।'

—কি হয়েছে?

—গলায় ক্যানসার।

—কে বললে?

—টেস্ট-ফেস্ট সব হয় গেছে।

—কি চিকিৎসা করাচ্ছেন?

—কিচ্ছু না, কোনো চিকিৎসাই নেই তো করাব কী!

—এই ভাবে, এই ভিড়ে বেরিয়েছেন কেন?

—উপায় নেই, যতদিন পারা যায় সংসারটাকে টেনে যাই। এরপর তো সব উপোসে মরবে। ভদ্রলোকের গলাটা ধরে ধরে এসেছে। কামরা ভর্তি লোক। আপাতত সবাই বাড়ি যাচ্ছেন, কেউ কেউ কিন্তু অন্য একটা গাড়ি চড়ে আরো অনেক দূর চলেছেন। দুটো যাত্রা একই সঙ্গে চলেছে। গাড়িও ছুটছে, কালও ছুটছে।

হঠাৎ মনে হল, এমন একটা মানুষকে বাঁচানো যায় না! এ যেন বাঘে ধরেছে! জলজ্যান্ত একটা মানুষকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে! এমন কোনো বন্দুক নেই যা দিয়ে সেই বাঘটাকে মারা যায়! এই মানুষটির জন্যে আমি একটা কিছু করতে চাই। ওঁর বদলে আমি মরতে চাই। একজনের টাকা, জমি, সম্পত্তি অন্যের নামে বদল করা যায়। অসুখটা যায় না? অনেক মহাপুরুষ পারতেন। রোগটা তুলে নিতেন। আমি শুনেছি।

ভদ্রলোক ঝিম মেরে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—আপনার জন্যে কী করতে পারি! আপনার এই কষ্ট কমাবার জন্যে আমি কী করতে পারি!

ওই ভিড়ের মধ্যেই আমার একটা হাত চেপে ধরে ভদ্রলোক বললেন, 'এমন কথা আজকাল কেউ বলে না। এমন কী আমার আত্মীয়-স্বজনরাও বলে না। আমার একটাই উদ্বেগ, মৃত্যুর পর আমার পরিবারের কী হবে! এই হৃদয়হীন পৃথিবীতে তারা কী ভাবে বাঁচবে! আমার তো সঞ্চয় কিছুই নেই।'

—আপনি মারা যাবেন এমন কথা ভাবছেন কেন?

—এ রোগে কেউ বাঁচে না। আজ আর কাল।

—আপনার পরিবারে কে কে আছেন?

—আমার বউ, আর আমার একটা সুন্দর মেয়ে। সবে কলেজে ঢুকেছে।

—আপনি কী করেন?

—একটা ফার্মে চাকরি করি। মাঝারি গোছের চাকরি। যা পাই, সংসারটা চলে যায়। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। আমার বউ খুব ভাল রাঁধে, আমার বউ খুব ভাল গান গায়। মেয়েটা রবীন্দ্রসংগীত শিখছে। বেশ গায়।

ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানা বললেন। আমার স্টেশান এসে গেল। গুঁতোগুঁতি করে নামলুম। এমন একজন মানুষ দেখলুম, যাঁর ভেতরে ঘড়ির কাঁটার মতো মৃত্যু চলেছে টিক টিক শব্দে। আজ হোক কাল হোক মরব জেনে, পৃথিবীতে কয়েকদিন বেঁচে থাকতে কেমন লাগবে, সেইটাই অনুমান করার চেষ্টা করলুম। গঙ্গার ধারে দাঁড়াতেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চোখে পড়ল। নির্জন গঙ্গা চাঁদের আলোয় ভাসছে। একটু দূরেই হিন্দুস্থানীর দোকান। রুটি তৈরি হচ্ছে গরম গরম। কম রেস্তর খদ্দেরদের জন্যে। সেইখানেই বসে গেলুম। আজ রাতে আর রান্নার মেজাজ নেই; কিন্তু খিদে আছে। মন বসে আছে মাথায়, খিদে বসে আছে পেটে। দূরত্ব অনেকটা, একতলা, তিনতলা, কিন্তু যোগাযোগ আছে। এটা জৈব তো ওটা দৈব।

গাবদা দুখানা রুটি, খানিকটা সবজি। উদোম ঝাল। টনক নড়ে যায়। খাচ্ছিআর মনকে খাওয়াচ্ছি। একটা আশ্বিনে বাতাস বয়ে আসছে গঙ্গার বুক থেকে। মা-দুর্গার চিঠির মতো। হঠাৎ মনে হল রুটিটা কে চিবোচ্ছে, আমি না মৃত্যু! আমিটা কে? আমিই তো মৃত্যু। আমার আমিটাই তো মৃত্যু। পাখি বসে আছে ডালে। গাইছে, শিস দিচ্ছে, ফল ঠোকরাচ্ছে। হঠাৎ উড়ে যাবে। পড়ে রইল ত্রিভঙ্গ ডাল। মৃত্যু পাখিটাই তো! ঘরের মধ্যে সে ছিল। ডেকেছি, সাড়া দিয়েছে, দোর খুলেছে। একদিন সাড়া নেই। বৃথাই ডাকাডাকি। কী হল! বললে, 'বাবু নেই, কাল চলে গেছে।'

'খাও মৃত্যু রুটি খাও। যতদিন পার বেঁচে থাক।'

মাথার মধ্যে কোথায় একটা ঝিম্ করে শব্দ হল। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণ। সেই বিশ্বরূপের মূর্তি। কৃষ্ণকালো গাত্রবর্ণ। মুখগহ্বরে ফরফরে আগুন। অনন্ত, অনল, অনির্বাণ শ্মশান-চিতা। পতঙ্গের মতো জীব অগ্নিমোহে ঝাঁপ দিচ্ছে সেই আগুনে। ভগবানের কণ্ঠস্বর বাতাসে।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

আমি মহাকাল। আগুনের ফরফর শব্দ আমার উল্লাসের অট্টহাসি। আমি ভীষণ। আমি সংহারিণী। মারো, অথবা নাই মরো, আমার অগ্নিবলয়ে তোমাদের ভোজন, ভজন, বিভাজন।

ঋতেইপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে

যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

আমার গুরুর মৃত্যু মনে পড়ে গেল। ঠিক তিন দিন আগে তিনি বললেন, 'আসন পেতে দাও।' আমরা আসন পেতে দিলুম। বললেন, 'আসনে ফুল বিছিয়ে দাও, তিনি এসে গেছেন।'

গুরুজী দেখতে পেয়েছিলেন, আমাদের সে-দৃষ্টি ছিল না। বললেন, 'গান শোনাও।'

গুরুজী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে লাগলেন, 'সাধু মরণে হুঁশিয়ার। মরবার সময় যা ভাববে তাই হবে। ভরতরাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করার জন্যে সাধন চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।'

সেই শূন্য আসনে কে ছিলেন জানি না। গুরুজী তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র-আলোচনা করছেন। দুয়ার বন্ধ, আমরা বাইরে থেকে শুনছি। হাসি-ঠাট্টা হচ্ছে। গান-গল্প হচ্ছে। হঠাৎ শুনলুম, 'সময় হয়েছে। চলুন এইবার ওঠা যাক।'

পড়ে রইল সব। সেই শূন্যতা কী অসীম!

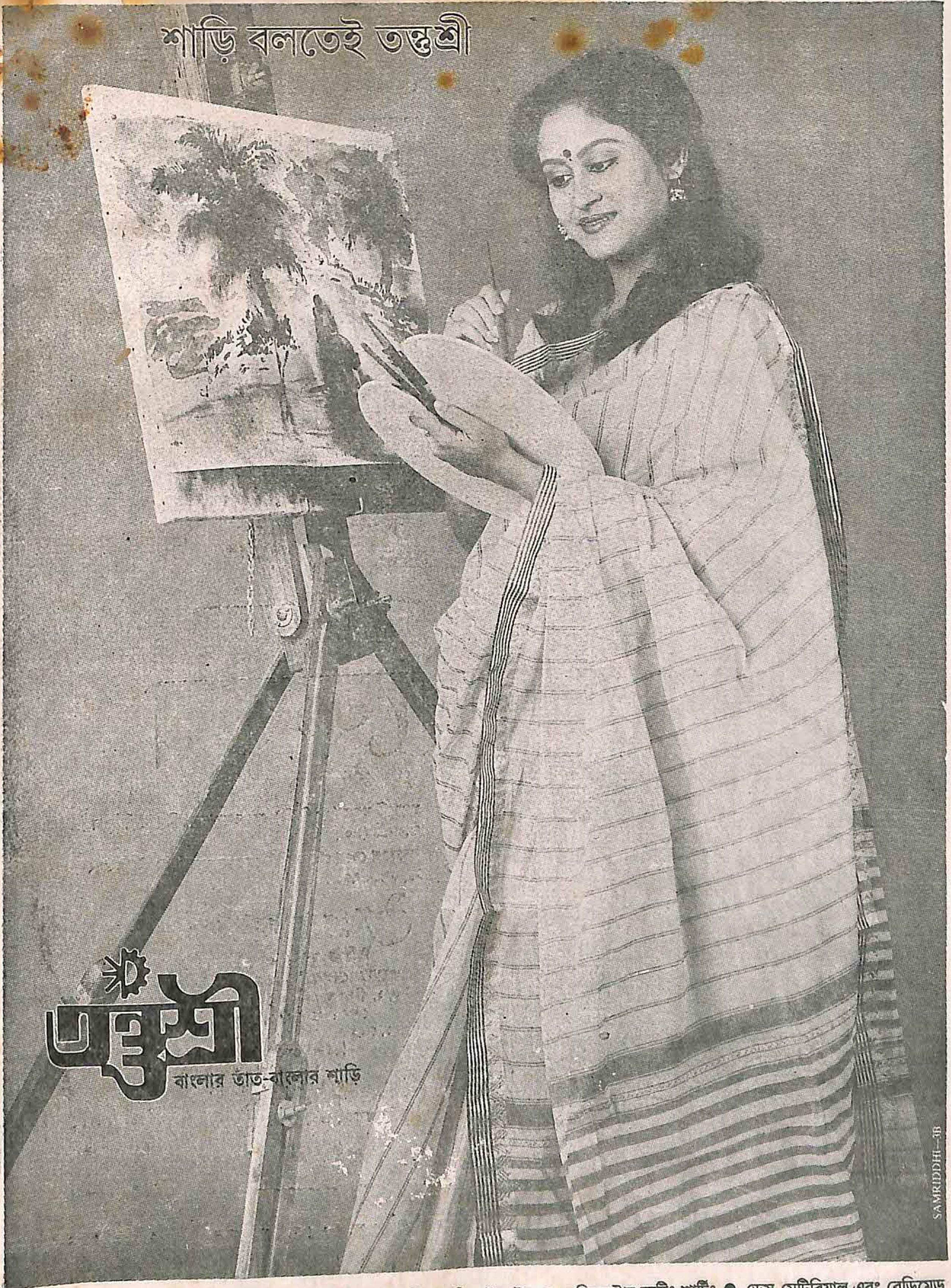
[ক্রমশ]

—সম্পাদক—

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সবিতেন্দ্রনাথ রায়

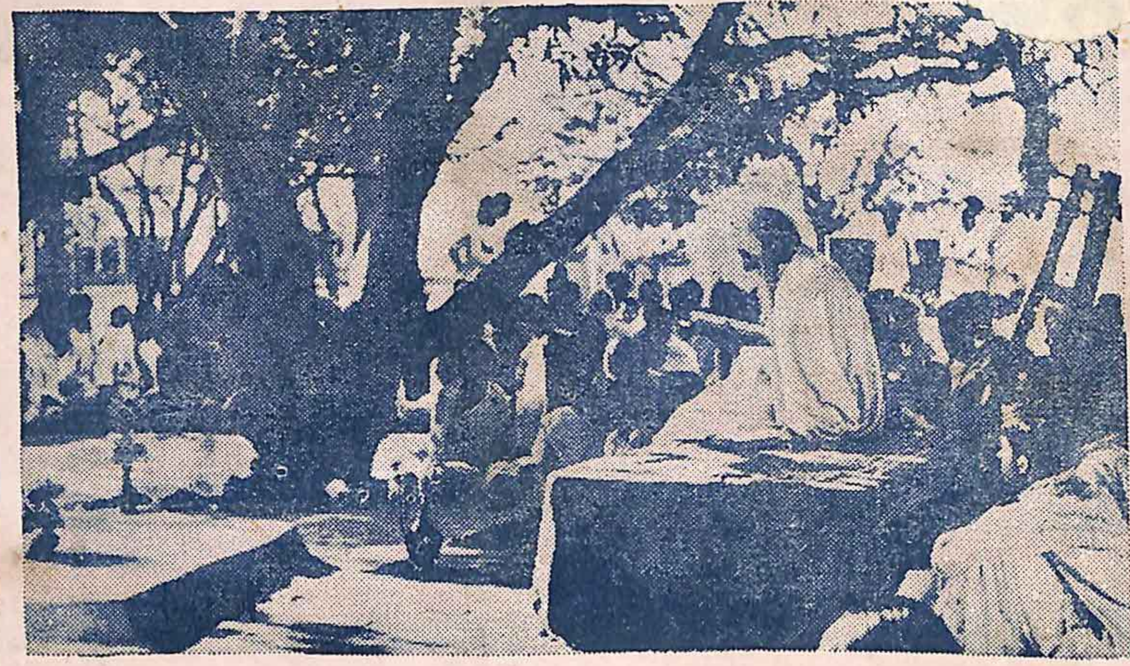
সহযোগী সম্পাদক : মণীশ চক্রবর্তী

মুদ্রণ ও প্রকাশক—পি. কে. পাল, শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯


শাড়ি বলতেই তন্তুশ্রী
তন্তুশ্রী
বাংলার তাঁত-বাংলার শাড়ি

KATHA-SAHITYA R. N. 2735/57 Rs. 4/- Reg. ...

ক্ষণকালের গীতি চিরকালের স্মৃতি



শান্তিনিকেতন

ছায়াঘেরা এই শান্তির নীড়ে এলে আজও অনুভব করবেন তার আকাশে বাতাসে পথে প্রান্তরে কবির সপ্রাণ উপস্থিতি। এই অনন্য মুক্ত প্রাণের আনন্দনিকেতনের যে প্রান্তেই যান সেই মর্ত্য ও অমর্ত্য, দেহ ও দেহাতীত, সীমা ও অসীমের কবির ভাবনা ও সৃষ্টি আপনার নিয়ত সঙ্গী। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ভবনের বিশিষ্ট স্থাপত্য-সৌকর্য ও নির্মাণশৈলীও আপনাকে অভিভূত করবে। আসুন উত্তরায়ণে—যেখানে কবি থেকেছেন বহুদিন—কবির স্মৃতি বিজড়িত উদয়ন, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী ও কোনার্ক। দর্শনীয় অনেক কিছুই—রবীন্দ্রভবন, বিচিত্রা, কলাভবন, নন্দন আর্ট গ্যালারী, সঙ্গীতভবন, পাঠভবন, চীনাভবন ও গ্রন্থাগার। এছাড়াও এখানে দেখবেন নবনির্মিত পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

আবার এই শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে আপনি চলে যেতে পারেন কাছাকাছি দেখার মতো নানা জায়গায়—শ্রীনিকেতন (৩ কি·মি), ডিয়ারপার্ক (৩ কি·মি), কাঁকালিতলা (৮ কি·মি), বক্রেশ্বর উষ্ণপ্রস্রবণ (৫৮ কি·মি), ম্যাসানজোড় বাঁধ (৭৮ কি·মি), কবি জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব (৪২ কি·মি), বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নানুর (২৩ কি·মি) এবং তন্ত্রসাধনার বিখ্যাত পীঠস্থান তারাপীঠ (৮০ কি·মি)।

কলকাতা থেকে ট্রেনে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব ১৬১ কি·মি এবং সড়কপথে ২০১ কি·মি।

বিশদ বিবরণ ও বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং রিজার্ভেসন কাউন্টার
ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০০০১,
ফোন : ২৮-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS
১, নেহরু রোড, দার্জিলিং, ফোন : ২০৫০, গ্রাম : DARTOUR
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি, ফোন : ২১৬৩২
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফরমেশন ব্যুরো,
এ/২, স্টেট এম্পোরিয়া, বাবা খরগ সিং মার্গ,
নিউ দিল্লী-১১০০০১, ফোন : ৩২-৩৮৪০
করিম ম্যানসন, ১৮৭, আন্না সালাই, মাদ্রাজ-৬০০০০২, ফোন . ৮৭৬১২

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদক : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সবিতেন্দ্রনাথ রায় : শ্রীসারদা প্রেস, ৫৫ কে. সি. সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট কলিকাতা ৬